মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পাথেয়

মূলঃ মুহাম্মদ বিন যাইনূ

সূচীপত্র

ভূমিকা ৩

জয়যুক্ত দল ৩

নাজাতপ্রাপ্ত দলের চলার রাস্তা (পথ নির্দেশিকা) ৪

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের হুকুমের প্রকারভেদ ৫

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিদর্শনসমূহ ৫

কারা জয়যুক্ত দল? ৬

তাওহীদ এবং তার শ্রেণী বিভাগ ৬

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থ কি? ৭

“আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই” ৮

একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাও ৮

আল্লাহ্ (সুব) আরশের উপর আছেন ৯

তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা ১০

তাওহীদের উপকারিতা ১০

তাওহীদ আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুনাহ মাফ করায় ১১

তাওহীদের উপকারিতা ১১

তাওহীদের শত্রুরা ১২

তাওহীদের ক্ষেত্রে আলেমদের ভূমিকা ১৩

ওহাবী অর্থ কি? ১৪

ওহাবী বলার ইতিহাস ১৫

তাওহীদ ও শির্‌কের দ্বন্দ্ব ১৬

হুকুম আহকাম শুধু আল্লাহ্ হতে ১৭

আক্বিদা আগে না হুকুমত আগে? ১৮

বড় শির্‌ক এবং তার শ্রেণী বিভাগ ১৮

বড় শির্‌কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ১৯

যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে ডাকে তাদের উদাহরণ ১৯

কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা হতে বিরত হব ২০

একত্ববাদী কে? ২১

ছোট শির্‌ক ও তাঁর শ্রেণী বিভাগ ২১

শির্‌কের বাহ্যিক প্রকাশ ২১

শির্‌কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ২১

মাজার ও দর্শনীয় বস্তু ২২

শির্‌কের ক্ষতিকর দিক এবং তার বিপদসমূহ ২৩

শরীয়ত মত অসিলা তালাশ করা ২৪

যে যে অসিলা খোঁজা নিষেধ ও দ্বীনের মধ্যে যার মূল্য নেই- তার শ্রেণী বিভাগঃ ২৫

আল্লাহ্ হতে সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী ২৫

বড় কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ ২৭

ছোট কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ ২৭
তাগুতদের থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও ২৮
বড় নিফাক ও মোনাফেকী ২৮
ছোট নেফাক বা ছোট মুনাফিকী ২৯
আল্লাহ্‌র (সুব) আউলিয়া ও শয়তানের আউলিয়া ২৯
ঈমানের শাখাসমূহ ৩০
কিভাবে বিপদ দূরীভূত হয় ৩১
মিলাদুন্নবী ৩১
আল্লাহ্ (সুব) ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত ৩২
নবী করীম (সঃ)-এর উপর দরূদের ফযীলত ৩৩
বেদআতী দরূদ ৩৪
আস সালাতু নারিয়া (দরুদে নারিয়া) ৩৪
আল-কুরআন জীবিতদের জন্য-মৃতদের জন্য নয় ৩৫
যে ধরনের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ ৩৬
যে ধরনের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত এবং পছন্দনীয় ৩৭
দুর্বল ও মউদ্বু হাদীস ৩৭
কিছু মউদ্বু হাদীস বা বানোয়াট হাদীস ৩৮
সহীহ হাদীসের উপর আমলের হুকুম ৩৮
কিভাবে আমরা কবর যিয়ারত করব? ৩৯
অন্ধ অনুসরণ ৩৯
সত্যকে প্রত্যাখ্যান কর না ৪০

ভূমিকা

পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র (সুব) নামে শুরু করছি

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (সুব)। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি। সাথে সাথে আমাদের অন্তরের কুমন্ত্রণা হতে এবং খারাপ আমল করা হতে বাঁচতে চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ্‌ (সুব) হেদায়াত দেন তাকে কেউ গোমরাহ্‌ করতে পারে না। আর যে গোমরাহ্‌ হয়ে যায় তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নাই এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের চলার পথ

আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে ভাগ হয়ে যেও না।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ১০৩)

এই ছোট বইটিতে ইসলামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের মাধ্যমে মুসলামদের খালেস একত্ববাদের দিকে এবং শিরক হতে বিরত থাকার জন্য ডাকা হচ্ছে, বেশির ভাগ মুসলিম দেশে যার প্রকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর কারণেই পূর্বের যামানার লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তা বর্তমান যামানার মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের জনগণ আজ যে কষ্ট-মুসিবত, দুর্ভাগ্য, যুদ্ধ, ফেতনা ভোগ করছে তার মূল কারণই হচ্ছে শিরক। এই বইটিতে সাথে সাথে বলা হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা ও ঈমান এবং সাহায্যপ্রাপ্ত দলের রাস্তা- যাতে আমরা ঐ রাস্তায় চলে জয়যুক্ত ও কামিয়াব হতে পারি। আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে এ নাযাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

জয়যুক্ত দল

১) আল্লাহ্‌ বলেনঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ে যেও না।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ১০৩)

২) অন্যত্র আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ "তোমরা ঐ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না, যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং যারা দলে দলে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়েই খুশি।" (সূরা রূম ৩০ঃ ৩১-৩২)

৩) আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) বলেনঃ *"আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য (যিনি সম্মানী ও বড়)। তোমাদের আমীরদের কথা শোনা এবং মান্য করার জন্য যদিও তোমাদের আমীর হয় কোন হাবশী (কাল) দাস এবং যদি কেউ তোমাদের মধ্যে বেশিদিন বাঁচে, তবে সে নানা রকম মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য এই যে, আমার সুন্নাতকে ও হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতসমূহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং ঐ সমস্ত সুন্নাতকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন আমল সংযোজন-এর ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকবে; নিশ্চয়ই সমস্ত নতুন আমলই বেদ'আত এবং সমস্ত বেদ'আতই গোমরাহী এবং সমস্ত গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নামের আগুন।"* (আবু দাউদ এবং অন্যরা, সহীহ)

৪) তিনি আরও বলেছেনঃ *"আমাদের নবী (সঃ) বলেনঃ ওহে, অবশ্যই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল (ইহুদী ও নাসারা) তারা ৭২ দলে ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং অবশ্যই আমার এই উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী এবং একদল জান্নাতী। তারা হল মুসলমানদের দল।"* (আহমদ, হাসান)

অন্য হাদীসে আছেঃ *"একমাত্র আমি এবং সাহাবীদের যারা অনুসরণ করে তারা ছাড়া অন্যরা জাহান্নামী।"* (তিরমিযী, হাসান)

৫) ইব্‌নে মাস্‌উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ *"আমাদের জন্য নবী (সঃ) একটি দাগ টানলেন। তারপর বললেনঃ এটা আল্লাহ্‌র (সুব) সোজা ও সঠিক রাস্তা। তারপর তার ডানে এবং বামে আরও কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেনঃ এগুলো অন্য রাস্তা যাদের প্রত্যেকটার শুরুতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর কুরআন থেকে পড়লেন- অবশ্যই এটা আমার সরল সঠিক রাস্তা, তোমরা অবশ্যই এর অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য রাস্তাসমূহকে অনুসরণ করো না, তাহলে এ রাস্তাসমূহ তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ্‌ (সুব) এভাবেই তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"* (আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহ)

৬) আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর গুনিয়াতুত্‌তালেবীন গ্রন্থে বলেনঃ জয়যুক্ত দল হল আহলে সুন্নাহ এবং জামাআত এবং তাঁদের অন্য কোন নাম নাই একমাত্র নাম হল আছহাবুল হাদীস বা হাদীদের অনুসারী। অর্থাৎ যারা হাদীস ও কুরআন মত চলে।

৭) আল্লাহ্‌ (সুব) আমাদের সকলকে হুকুম করছেনঃ আমরা যেন সকলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরি এবং আমরা যেন ঐ মুশরেকদের মত না হই যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে দলে দলে, গোত্রে গোত্রে ভাগ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র (সুব) নবী (সঃ) আমাদের জানাচ্ছেন যে, অবশ্যই ইহুদী ও খৃষ্টানরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং অবশ্যই মুসলমানরা তাদের থেকেও বেশি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর এই দলে দলে বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। তাদের পথ বিচ্যুতি এবং আল্লাহ্‌র (সুব) কিতাব থেকে দূরে সরে থাকা এবং তাঁর নবীর সুন্নাত থেকে দূরে সরে থাকা এই সমস্ত কারণেই তারা বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে একদল মুক্তি পেয়ে জয়যুক্ত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরাই হল ঐ দল যারা আল্লাহ্‌র (সুব) কালাম ও নবী (সঃ)-এর সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরে এবং সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) আমল সমূহ অনুসরণ করে।

নাজাতপ্রাপ্ত দলের চলার রাস্তা (পথ নির্দেশিকা)

১) তারাই এ দল যারা নবী (সঃ) -এর জীবিত অবস্থায় তাঁর রাস্তাকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবীদের রাস্তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর তা হল কুরআন প্রদত্ত রাস্তা যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা যা রাসূল তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, যা আমাদের কাছে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে পৌঁছেছে। আর তিনি তাঁর উম্মতকে হুকুম করেছেন সেটিকে আঁকড়ে ধরতে। রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"তোমাদের মধ্যে আমি দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তাদের আঁকড়ে ধর তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার সুন্নাহ এবং যারা তাদের আঁকড়ে ধরবে তা তাদের আলাদা করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার হাউযে কাউসারে পানি পান করবে।"* (সহীহ, জামে সাগীর)

২) এ দল আল্লাহ্‌র (সুব) কিতাব ও নবীর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যখন তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ বা গোলযোগ দেখা দেয়। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র (সুব) কথার উপর আমল করে। যেমন আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যখন তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হয়, তখন তার বিচারের ভার আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র (সুব) উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান এনে থাক। এটিই উত্তম এবং সুন্দর ব্যাখ্যা।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৫৯)

আল্লাহ্ (সুব) আরও বলেনঃ "না, কখনও না, তোমার রবের কসম! তারা কখনই ঈমানদার হতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তা মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পন না করে, তারপর বিচার হলে তাতে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় না, যা তুমি বিচার করে দিয়েছ তাতে এবং তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৬৫)

৩) এই দল আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)-এর কথার উপর অন্য কারো কথার প্রাধান্য দেয় না। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেছেনঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথার বিরুদ্ধে চলে যেও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) সবকিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ ১)

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার ভয় হয় তোমাদের (সাহাবা) উপর আকাশ থেকে আযাবের পাথর বর্ষিত হবে। আমি তোমাদের বলি রাসূল (সঃ) এভাবে বলেছেন, আর তোমরা বল আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এভাবে বলেছেন।

৪) নাজাতপ্রাপ্ত দল তাওহীদকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিবে। আর তা হবে আল্লাহ্‌র (সুব) একত্ববাদের প্রকাশ করাঃ উত্তম সাহায্য চাওয়া এবং বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট দোয়া করা, যবেহ করা, নজর দেয়া, তাওয়াক্কুল (ভরসা), আল্লাহ্‌র (সুব) শরীয়তের দ্বারা বিচার এবং বাকি অন্যান্য সমস্ত ধরনের ইবাদত । আর এগুলোর উপর ভিত্তি করেই সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হবে। অবশ্যই শিরককে দূরীভূত করতে হবে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য যে, শিরক আজ বেশির ভাগ ইসলামী দেশে দেখা যাচ্ছে তাদেরকেও দূর করতে হবে। কারণ তাওহীদের দাবীই হচ্ছে এগুলোকে দূর করা। কোন দলই আল্লাহ্‌র (সুব) সাহায্য পেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদকে পিছনে রাখে এবং প্রত্যেক ধরনের শির্‌কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে। এ সমস্ত কথার উত্তম নিদর্শন প্রত্যেক রাসূলরা এবং আমাদের রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত রাস্তায়।

৫) এই দল রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহকে জীবিত করে ইবাদতের মধ্যে, চরিত্র গঠনের মধ্যে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ফলে নিজেদের সমাজে তারা আগন্তুকের মত হয়ে যায়। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র (সুব) নবী (সঃ) বলেছেনঃ *"ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত আগন্তুকের মত এবং আবার ফিরে আসবে অপরিচিত আগন্তুকের মত যেমন শুরুতে ছিল। সেই আগন্তুকের জন্য রইল শুভেচ্ছা।"* (সহীহ মুসলিম)

অপর বর্ণনায়ঃ *"ঐ সমস্ত আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ যারা মানুষদের সংশোধনের চেষ্টা করে যখন তারা নষ্ট হয়ে যায়।"* (সহীহ, আবু আমর)

৬) এই দল আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সঃ)-এর কথা ছাড়া অন্য কারো অন্ধ অনুসরণ করে না, যিনি ছিলেন মাসুম (গোনাহ থেকে পবিত্র); যিনি নিজের মনগড়া কোন কথা বলেননি। তিনি ছাড়া অন্য মানুষ, যিনি যতই বড় হন না কেন, ভুল করতে পারেন।

আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলেনঃ *"প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল-ভ্রান্তি করবে এবং সবচেয়ে উত্তম ভুলকারী ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি তওবা করে এবং ভ্রান্ত পথ হতে ফেরত আসে।"* (আহমদ, হাসান)

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, নবী (সঃ)-এর পর এমন কোন ব্যক্তি নাই যার সমস্ত কথা গ্রহণ করা যায়, অথবা পরিত্যাগ করা যায়।

৭) নাজাতপ্রাপ্ত দল হল তারা যারা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চলেন। যাদের সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্বদা হক্কের উপর থাকবে। তাদের যতই অপমান করা হোক না কেন, কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কিয়ামত আসে।"* (সহীহ মুসলিম)

৮) এই দল চার মুজতাহেদ ইমামকে সম্মান করে। তাদের কারো একজনের অন্ধ অনুসরণ করে না। বরং কুরআন ও ফেকাহ্‌র মাসআলা গ্রহণ করে। তাদের সকলের কথা হতেই মাসআলা গ্রহণ করে যদি সেই কথাগুলো সহীহ হাদীসের সাথে মিলে। এটা তাঁদেরই কথার উপর আমল। কারণ তারা তাদের অনুসারীদের বলেছেন, সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে এবং যত কথাই এর বিপরীত হবে তা ত্যাগ করতে।

৯) এই দল মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করে। তারা বেদ'আতের সমস্ত রাস্তাকে অস্বীকার করে এবং ঐ সমস্ত দলকেও অস্বীকার করে যারা ইসলামকে ও উম্মতকে টুকরো টুকরো করছে এবং দ্বীনের মধ্যে বেদ'আতের প্রবর্তন করছে এবং সাথে সাথে নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের রাস্তা হতে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে।

১০) এই দল মুসলমানদের রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে ডাকেন যাতে তারা জয়যুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ্‌র (সুব) দয়ায় এবং রাসূল (সঃ)-এর শাফায়াতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেন।

১১) এই দল ঐ বিচার ও আইনের বিরোধিতা করে যা মানুষের তৈরি-যা ইসলাম ও শরীয়তের পরিপন্থী। বরঞ্চ এরা মানব জাতিকে ডাকেন আল্লাহ্‌র (সুব) কিতাব অনুযায়ী বিচার কায়েম করার দিকে, যা আল্লাহ্ (সুব) মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখের জন্য নাযিল করেছেন। কারণ তিনিই উত্তমভাবে জানেন কিসে তাদের উপকার হবে। এটা অপরিবর্তনীয়- সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কখনই তার পরিবর্তন হবে না। আর প্রত্যেক যামানার লোকদের জন্যই তা প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই সারা বিশ্বের মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের দুর্ভাগ্যের কারণ এবং তারা যত পেরেশানী ভোগ করছে এবং অপমান, অপদস্ত হচ্ছে তার বিশেষ কারণ হল আল্লাহ্‌র (সুব) এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত মত বিচার হচ্ছে না। মুসলামনদের সম্মান কখনোই আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলামের শিক্ষার দিকে ফিরত আসবে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) কখনোই কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের পরিবর্তন করেন।" (সূরা রা'দ ১৩ঃ ১১)

১২) এই দল সমস্ত মুসলমানদের আল্লাহ্‌র (সুব) রাস্তায় জিহাদ করার জন্য ডাকে এবং প্রত্যেক মুসলিমের উপর তাদের ক্ষমতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদ করা ওয়াজিব। আর জিহাদ নীচের নিয়ম অনুযায়ী হবেঃ

প্রথমতঃ জিহ্বার দ্বারা এবং লেখনীর দ্বারাঃ মুসলমানদেরকে এবং অন্যদেরকেও সত্যিকার ইসলামকে আঁকড়ে ধরার জন্য দাওয়াত দিতে এবং শির্‌কমুক্ত তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার জন্যও, যে শির্‌ক আজ বেশির ভাগ মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) ভবিষ্যদ্বানী করে বলেছেনঃ *"ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হতেই পারে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু দল মুশরিকদের সাথে মিলে না যায় এবং আমার উম্মতের কিছু দল গাছ, পাথরের পূজা না করে।"* (সহীহ, আবু দাউদ)

দ্বিতীয়তঃ মালের (টাকার) দ্বারা জিহাদ করাঃ যার ভিতরে ইসলাম প্রচারের জন্য খরচ করা এবং এর দিকে সত্যিকারভাবে দাওয়াত দিচ্ছে যে কিতাবসমূহ তা ছাপিয়ে বিলি করা, যারা দুর্বল ঈমানদার তাদের ঈমানকে দৃঢ় করে তুলতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল খরচ করা, অস্ত্র তৈরী ও কেনার জন্য মাল খরচ করা এবং মুজাহিদদের তৈরী করার জন্য। আর অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস তাঁদের দরকার হয়, যেমন- খাওয়া, পরা ইত্যাদির জন্যও।

তৃতীয়তঃ জীবনের দ্বারা জিহাদ করাঃ যার মধ্যে রয়েছে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা। যাতে করে আল্লাহ্‌র (সুব) কলেমা উচু হয় এবং কাফেরদের কথা নিচু হয়। রাসূল (সঃ) ঐ সমস্ত দিকের কথা ইরশাদ করে বলেনঃ *"তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থাক, মালের দ্বারা, জীবনের দ্বারা এবং মুখের দ্বারা।"* (সহীহ, আবু দাউদ)

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের হুকুমের প্রকারভেদ

১) ফরজে আইনঃ যখন কাফেরার কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমন করে তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকলের উপরই ফরজ। যেমন- ফিলিস্তিন যা আজ শয়তান ইহুদীরা জোর করে দখল করেছে। যতক্ষন পর্যন্ত সামর্থবান মুসলমানরা তাদেরকে ওখান থেকে বের না করবে এবং মসজিদে আক্‌সাকে মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে না আনবে জান ও মাল দিয়ে, জিহাদ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই পাপী হবে।.

২) ফরজে কেফায়াঃ যখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান এই জিহাদের জন্য তৈরি হবে তখন বাকীরা পাপমুক্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে ইসলামের দাওয়াতকে সারা দুনিয়াতে ছড়ানো যাতে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ ইসলামের উপর চলতে শুরু করে। আর যারা তাদের বাধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যাতে দাওয়াতের কার্য নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিদর্শনসমূহ

প্রথমতঃ মানুষের মধ্যে এদেও সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাদের জন্য রাসূল (সঃ) এই দোয়া করেছেন যেঃ *"সেই আগন্তুকের জন্য সুসংবাদ। তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত লোকেরা যারা অগিত গুনাহগার লোকদের মধ্যে চলবে, যদিও যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক তাদের বিরোধিতা করবে।"* (সহীহ, আহমেদ)

"এবং আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই শোকরগুজার।" (সূরা সাবা ৩৪ঃ ১৩)

দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সঙ্গে বেশির ভাগ লোকেরা শত্রুতা করে। তাঁদের উপর নানাবিধ দোষারোপ করে। তাদের নানা রকম বিকৃত নাম দিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। নবীদের সাথে যে ব্যবহার করা হত ঠিক সেই রকম ব্যবহার তারাও পায়। আল্লাহ্ (সুব) তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ

"এবং এভাবেই আমি তৈরী করেছি প্রত্যেক নবীর শত্রু। মানুষ ও জ্বীন শয়তানের মধ্য হতে এরা একে অপরের কাছে গোপনে যোগাযোগ করে। আর সুন্দর করে সাজিয়ে ধোঁকার সাথে কথা বলে।" (সূরা আন্‌আম ৬ঃ ১১২)

আর এভাবে আমাদের রাসূল (সঃ) যখন মানুষদের তাওহীদের দিকে ডাকছিলেন তখন তাঁর কওমের লোকেরা তাঁকে চরম মিথ্যাবাদী ও যাদুকর বলেছিল-যাকে পূর্বে তারা বলত সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। গ্রান্ড মুফতি শেখ বিন বাযকে এদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ তাঁরাই ওরা, যারা সকল কাজে রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করে এবং সলফে সালেহীনদের রাস্তায় চলে।

কারা জয়যুক্ত দল?

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্বদা সত্যের উপর থাকবে, কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে পারবে না, যতই তাঁরা তাদের অপমান করতে চেষ্টা করুক না কেন। আর তাদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।"* (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সঃ) আরও বলেনঃ *"যখন সিরিয়াবাসীরা ফেতনা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নাই। আমার উম্মতের একদল সর্বদাই জয়যুক্ত হবে কিয়ামত পর্যন্ত। যারা তাদের অপদস্ত করতে চাইবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"* (আহমদ, সহীহ)

১) ইমাম ইব্‌নে মোবারক (রহঃ) বলেনঃ তাঁরা হল হাদীসের অনুসারীরা।

২) ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর উস্তাদ আলী ইব্‌নে মাদানী (রহঃ) থেকে বলেনঃ তাঁরা হচ্ছেন হাদীসের অনুসারীরা।

৩) ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেনঃ যদি তারা হাদীসের অনুসারীরা না হয়, তবে জানি না এরা কারা।

৪) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে বলেনঃ তোমরা আমার চেয়ে বেশি হাদীস জান। যখন তোমরা কোন সহীহ হাদীস পাও, আমাকে জানাবে, যাতে আমি তার থেকে মাযহাব (মতবাদ) বানাতে পারি। হোক না সে হাদীস হেজাজীদের বা কুফাবাসীদের বা বসরাবাসীদের।

৫) তারা সর্বদা প্রতি কাজে রাসূল (সঃ)-এর সহীহ সুন্নাহকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর দেখানো রাস্তায় চলে এবং তাঁর চরিত্রের রঙে রঞ্জিত হতে চায়। তারা কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করে না। বরঞ্চ সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) কে অনুসরণ করে।

৬) ইমাম খতীব বাগদাদী (রহঃ) তাঁর 'শরাফু আহলুল হাদীস' কিতাবে রলেনঃ যদি নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী চলার দল ঐ উপকারী ইল্‌ম নিয়ে ব্যস্ত হত এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাতকে খোজ করত তবে দেখত নবীর সুন্নাহ-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় একত্ববাদের মূল সূত্রগুলো এবং আল্লাহ্‌র (সুব) সিফাতসমূহ, জান্নাত ও জাহান্নামের খবর, সুসংবাদ ও শাস্তির কথা।

আরও পাওয়া যায়- আল্লাহ্‌ (সুব) মুত্তাকী এবং পাপীদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কি বানিয়েছেন এবং আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌ (সুব) কি সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে আরো পাওয়া যায়, নবীদের ঘটনাসমূহ এবং দুনিয়া বিমুখ আল্লাহ্‌র ওলীদের ঘটনাবলী এবং ভয় প্রদর্শন। আরও পাওয়া যায়, ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের কথা, রাসূল (সঃ)-এর ভাষণ এবং তাঁর মোযেজাসমূহ। তাতে আছে পবিত্র কুরআনের তাফসীর আর আছে বহু বিশেষ ঘটনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং সাহাবীদের কথাসমূহ যার মধ্যে শরীয়তের অনেক হুকুমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ (সুব) আল-কুরআন ও হাদীসকে শরীয়তের মূল ভিত্তি তৈরি করেছেন এবং এর মাধ্যমে সমস্ত নিকৃষ্ট শির্‌ক-কুফর ও বেদআতকে ধ্বংস করেছেন। আর তাঁরা হচ্ছে আলস্নাহর (সুব) সৃষ্টির মধ্যে তাঁর আমানতদার এবং নবী (সঃ) ও তাঁর উম্মতের মধ্যে যোগসূত্র । তাঁরা আল-কুরআন অনুসরনকারী ও হাদীসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁদের জ্যোতি প্রকাশমান এবং সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের ফযীলত বিরাজমান এবং যারা নিজেদের মন মত চলে তারা যেন তারা যেন তাঁদেও কাছে ফিরে আসে আত্মশুদ্ধির জন্য। তাদের অবলম্বন আলস্নাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাত এবং তারা নবী (সঃ)-এর দলভুক্ত। তাঁর সাথেই তাঁদের সম্পর্ক এবং তাঁরা অন্যের কথার কর্ণপাত করে না। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা চালিত করে তাদেরকে তিনি অপমানিত করেন। "হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে আল-কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চালিত করুন, তার উপর আমল করার তৌফিক দিন এবং তার উপর যারা চলে তাঁদের ভালবাসতে দিন, আর তাঁদের সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।" (আমীন)

তাওহীদ এবং তার শ্রেণী বিভাগ

তাওহীদ হচ্ছে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত যার জন্য তিনি এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি জ্বীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য।" (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)

অর্থাৎ আমারই ইবাদত করবে এবং আমারই নিকট দোয়া করবে। এই আয়াত তাদের কথাকে বাতিল করে যারা বলে দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর কারণে।

তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. রবুবিয়াতঃ এটা হল এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ্‌ পাকই প্রতিপালক এবং স্রষ্টা। কাফেররা তাওহীদের এই অংশকে স্বীকার করত, এতদসত্ত্বেও তারা ইসলামে প্রবেশ করে নাই।

আল্লাহ্‌ (সুব) তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ "যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্‌।" (সূরা যুখরুফ ৪৩ঃ ৮৭)

কিন্তু নাস্তিকরা আল্লাহ্‌র (সুব) অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তারা অজ্ঞ যামানার কাফেরদের থেকেও বড় কাফের।

২. ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ববাদঃ তা হল আল্লাহ্‌র (সুব) ইবাদত করা। শরীয়াত সম্মত ইবাদতের মধ্যে আছে দোয়া, সাহায্য চাওয়া, তওয়াফ করা, জবেহ করা, নজর (মানত) দেয়া এবং অন্যান্য। কাফেররা এই তাওহীদকে অস্বীকার করত। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া 'আলাইহিমুসসালাম' এবং তাঁদের উম্মতদের মধ্যে শত্রুতা চলেছে এই তাওহীদের জন্যই। তাই এ ঘটনাসমূহ পবিত্র

কুরআনের বহু সূরাতে আলোচিত হয়েছে। এক আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার জন্যও বলা হয়েছে। আমরা সূরা ফাতিহা-তে পড়িঃ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাই না। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শুধু তাঁর নিকট দোয়া করা, কুরআন অনুযায়ী বিচার করা, শরীয়ত অনুযায়ী হুকুমাত গঠন করা। আর এই সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র (সুব) ঐ কথার অন্তর্ভুক্ত। যাতে তিনি বলেনঃ

"অবশ্যই আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া সত্যিকার অন্য কোন মা'বুদ নাই, তাই আমারই ইবাদত কর।" (সূরা তাহা ২০ঃ ১৪)

৩) আল্লাহ্‌র (সুব) সুন্দর নাম ও গুণবাচক একত্ববাদঃ তা হল আল্লাহ্‌র (সুব) গুণাবলী সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা যা পবিত্র কুরআনে আছে এবং সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, তার উপর ঈমান আনা। সাথে সাথে যে সমস্ত গুণাবলীতে আল্লাহ্ (সুব) নিজেকে ভূষিত করেছেন অথবা তাঁর নবী (সঃ) বিভূষিত করেছেন সত্যিকার অর্থে- কোন অপব্যাখ্যা ছাড়াই, কোন নির্দিষ্ট আকার ব্যতীতই অথবা না বুঝে ছেড়ে দেয়া ছাড়াই তার উপর ঈমান আনা। যেমনঃ- এসতোয়া এর অর্থ হল বসা, নুজুল, অবতীর্ণ হওয়া, সেই রকম হাত, উপস্থিত হওয়া এবং অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে। এর তাফসীর যা সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে তা বিশ্বাস করা। যেমন "ইসতোয়া" সম্বন্ধে সহীহ বুখারীতে তাবেয়ীনদের রেওয়াত আছে তা হল উর্ধ্বে উঠা ও আরোহণ করা, তবে তা তাঁর হাইছিয়াত অনুযায়ী হবে।

"তাঁর মত কেউ নেই- কিন্তু তিনি শুনেন এবং দেখেন।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ১১)

এর অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা- শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র (সুব) ক্ষেত্রে তা স্বীকার করা।

১. **تاويل** তা'বিলঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কোন আচরণ করাই হচ্ছে তা'বিল। যেমন এসতোয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদি অর্থ ইসতাওলা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা বুঝায়।

২. **تعطيل** তা'তীলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমনঃ আল্লাহ্ (সুব) আসমানের উপর আছেন। কিন্তু আমাদের অনেকের নিকট এ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আল্লাহ্ (সুব) সর্বত্র বিরাজমান।

৩. **تكيف** তাকইফঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন গুণকে কোন নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমনঃ- আল্লাহ্ (সুব) যে আরশের উপর আছে তা তার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা। তিনি কিভাবে আরশের উপর আছে তা কেউ জানে না।

৪. **تمثيل** তামছিলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা। যেমনঃ- আল্লাহ্ (সুব) প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়। আর অবতীর্ণ হওয়ার হাদীস মুসলিম শরীফে বর্নিত হয়েছে সহীহ সনদে। অনেকে মিথ্যা বলেন যে, শাইখুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর কিতাবে এ ধরনের তামছীল বা তুলনা করেছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার কিতাব পড়লে দেখা যাবে তিনি তুলনা বা উপমা এভাবে দেন নাই।

৫. **تفـويض** তাফবীদঃ সলফে সালেহীনদের মত আল্লাহ্‌র (সুব) আকৃতির ব্যাপারে কোন কথা আসলে তা তারা বলতেন আমরা আকৃতি জানি না কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন ইসতোয়া অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ কিন্তু কিভাবে উর্ধ্বে আরোহণ করেছেন তা আমরা জানি না।

৬. কিন্তু অন্য দল যারা আল্লাহ্‌র (সুব) এই সমস্ত সিফতের স্বীকার করে তারা অর্থ এবং অবস্থান উভয়কেই অস্বীকার করে। তা ঐ সমস্ত সলফে সালেহীনদের কথার উল্টো যেমন উম্মু সালামাহ (রাঃ) ইমাম রবীয়া (রহঃ) যিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম মালিক (রহঃ)। কারণ, তারা সকলেই বলেছেন, ইসতোয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর কৈফিয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদা'আত।

৭. কালেমা لاإلهإلاالله ততক্ষণ পর্যন্ত তার উচ্চারণকারীকে উপকার দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে এর সাথে কোন শির্‌ক না করে। এটা ওযুর মত যা বায়ু, প্রস্রাব বা পায়খানা করার দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ঐ সমস্ত ইবাদত যা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট তা যখন অন্য কারো জন্য করা হয় তখন তা শির্‌ক হয়ে যায়। যেমনঃ দোয়া করা, যবেহ করা, মাজারে নজর মানত দেয়া এবং এ জাতীয় সমস্ত ইবাদত।

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থ কি?

এই বিশ্বাস নিতে হবে, তিনি আল্লাহ্‌র (সুব) নিকট হতে প্রেরিত। ফলে তিনি যা বলেছেন তাকে সত্য বলে স্বীকার করব এবং যা হুকুম করেছেন তাকে মানব এবং যে সম্পর্কে নিষেধ করেছেন অথবা সাবধান করেছেন তার থেকে বিরত থাকব। কারণ, তাঁর কথা মান্য করাই আল্লাহ্‌কে মান্য করা।

১) শেখ আবুল হাসান নদভী তার নবুয়ত গ্রন্থে বলেনঃ প্রত্যেক যামানায় এবং প্রত্যেক এলাকায় সমস্ত নবীদের প্রথম দাওয়াত এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র (সুব) ব্যাপারে আক্বীদাকে শুদ্ধ করা, বান্দা ও তাঁর প্রতিপালকের মধ্যে সম্মন্ধকে শুদ্ধ করা, এখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র (সুব) দ্বীনকে মানার দিকে দাওয়াত দেয়া এবং একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা তিনিই রাখেন এবং দোয়া, বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা এবং যহেব করা সবই তাঁর জন্য। নবীগণ প্রত্যেকে তাদের যামানায় যে ধরনের পূজা হত তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। যেমন- মূর্তি ও পাথরের পূজা, জীবিত বা মৃত পবিত্র ও নেক লোকের পূজা।

২) আল্লাহ্ (সুব) আমাদের রাসূল (সঃ) সম্বন্ধে বলেনঃ

“বল, (হে নবী)! আল্লাহ্ (সুব) যা চান তা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্যও কোন ভাল বা মন্দ করার অধিকারী নই এবং যদি গায়েব সম্বন্ধে জানতাম তবে খুব বেশি ভালই চাইতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতিই স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো একমাত্র ভয় প্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঐ জাতির জন্য যারা ঈমান এনেছে।” (সূরা আরাফ ৭ঃ ১৮৮)

অন্যত্র রাসূল (সঃ) বলেনঃ *“আমার প্রশংসার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কর না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইব্নে মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে। আমার একমাত্র পরিচয় আমি বান্দা। তাই বল, আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।”* (সহীহ বুখারী)

الاطراء ---- শব্দের অর্থ হচ্ছে বাড়ান ও প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। আমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে তাঁকে ডাকব না যেমন করেছে খৃষ্টানরা। ফলে তারা শির্কে পতিত হয়েছে।

৩) রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত হল তাঁর হুকুম মেনে চলার মধ্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করাতে এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যের কাছে দোয়া না করাতে, যদিও সে রাসূলই হোক না কেন বা আল্লাহ্র অলীই হোক না কেন। আল্লাহ্র (সুব) নবী (সঃ) বলেনঃ *“যদি চাইতে হয় আল্লাহ্র (সুব) কাছে চাও এবং যদি সাহায্য চাও তবে আল্লাহ্র কাছেই চাও।”* (তিরমিযী, হাসান, সহীহ)

আর রাসূল (সঃ)-এর উপর যখন কোন দুঃখ বা পেরেশানী আসত তখন বলতেনঃ

“হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার দ্বারা বিপদ উদ্ধার চাচ্ছি।” (তিরমিযী, হাসান)

“আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই”

তোমাকে ছাড়া আমরা অন্য কারও ইবাদত করি না, দোয়াও করি না এবং আর কারো কাছে সাহায্যও চাই না, হে আল্লাহ্!

১. ভাষাবিদরা বলেছেন مفعول به কে আগে আনা হয়েছে حصر এবং تخصيص এর জন্য অর্থাৎ ইবাদত এবং সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্ হতে- তিনি ছাড়া এগুলোকে কারও হাত নেই।

২. এই আয়াত যা প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যহ বারে বারে পড়ে সালাতে ও সালাতের বাইরে তা সূরা ফাতিহার মূল এবং সূরা ফাতিহা আবার সমস্ত আল-কুরআনের মূল।

৩. ইবাদত বলতে এই আয়াতে সমস্ত ধরনের ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- সালাত, মানৎ, যবেহ, আর দোয়ার তো কথাই নেই। কারণ, নবী (সঃ) বলেন, *“দোয়া হচ্ছে ইবাদত।”* (হাসান, সহীহ, তিরমিযী)

সালাত হচ্ছে ইবাদত। তাই তা কোন রাসূল কিংবা অলীর জন্য পড়া জায়েয নয়। তেমনি দোয়াও। কারণ তাও ইবাদত। তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র (সুব) জন্য। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ “বল (হে নবী)! আমি শুধুমাত্র আমার প্রতিপালককে ডাকি এবং তাঁর সাথে কারো শরীক করি না।” (সূরা জ্বীন ৭২ঃ ২০)

৪. এবং নবী (সঃ) বলেনঃ

“ইউনূছ (আঃ)-এর দোয়া যা তিনি মাছের পেটে বসে করেছিলেনঃ তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত; এই দোয়া যে কোন মুসলমানই যে কোন ব্যাপারে করুক না কেন অবশ্যই আল্লাহ্ (সুব) তার দোয়াকে কবুল করেন।” (সহীহ, হাকিম)

৫. আল্লাহ্র (সুব) ইবাদত একমাত্র তার জন্যই হবে এবং তাঁর নিকটে দোয়ার মাধ্যমে। হে আল্লাহ্! আমি চাই তুমি আমার দুঃখ দূর কর! কারণ দুঃখ কষ্ট আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারে না।

একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাও

আল্লাহ্র নবী (সঃ) বলেনঃ *“যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহ্র নিকট চাও, আর যখন সাহায্য চাও তখনও তাঁর কাছে চাও।”* (হাসান, সহীহ, তিরমিযী)

১. ইমাম নবভী (রহঃ) এবং হাইসামী (রহঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কাজে সাহায্য চাও তখন একমাত্র আল্লাহ্র (সুব) কাছেই চাও। বিশেষ করে এ সমস্ত কাজে যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যেমন- রোগমুক্তি, রিযিক এবং হেদায়েত চাওয়া, কারণ এ সমস্ত জিনিসই খাস করে আল্লাহ্র (সুব) হাতে। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ “যদি আল্লাহ্ (সুব) কাউকে বিপদে পতিত করেন তবে তাকে আল্লাহ্ ছাড়া কেহ সারাতে পারে না।” (সূরা আনআম ৬ঃ ১৭)

২. আর এটাও সম্ভব যে, আমরা জীবিত মানুষদের নিকট ঐ সমস্ত কাজে সাহায্য চাইতে পারি যা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে। যেমন- মসজিদ নির্মানে সাহায্য, কোন কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য, কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ “তোমরা একে অপরকে নেক কাজ ও পরহেজগারিতে সাহায্য কর এবং একে অপরকে পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না।” (সূরা মায়িদা ৫ঃ ২)

যে ব্যক্তি কোন প্রকার দলিল প্রমাণ চায় আল-কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে উদ্ধারকারী চায় আল্লাহ্ পাকই তার জন্য যথেষ্ট; যে ভয় প্রদর্শনকারী চায় মৃত্যুই তার জন্য যথেষ্ট। আর এ সমস্ত জিনিসের কোনটাই যার জন্য যথেষ্ট নয়, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "আল্লাহ্ই কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" (সূরা যুমার ৩৯ঃ ৩৬)

৩. শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আল-ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থে বলেনঃ আল্লাহ্র (সুব) কাছে সাহায্য চাও এবং অন্য কারো কাছেই সাহায্য চেও না। তোমার জন্য ধিক; কি মুখে তুমি আল্লাহ্র সাথে দেখা করবে কিয়ামতের দিন। তাঁর সাথে তুমি দুনিয়াতে ঝসড়া করেছ। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তাঁর সাথে শির্ক করে সৃষ্টির দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছ। তাদের মাধ্যমে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস অবতীর্ণ করিয়েছ। তোমার দরকারী কাজে তাদের উপর ভরসা করছ। তাদেরকে তোমার ও তোমার আল্লাহ্র মধ্যে সংযোগকারী বানিয়েছ। তাদের সাথে থাকাটা তোমার জন্য ফেতনা। না রাজত্ব, না ক্ষমতা, না দৌলত, না সম্মান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকটে আছে। সর্বদা হক তায়ালার সাথে থাকতে চেষ্টা কর এবং বান্দাদের কথার দিকে দৃষ্টিও নিক্ষেপ কর না।

৪. যে সমস্ত সাহায্য চাওয়া শরীয়ত সম্মতঃ আল্লাহ্র নিকট কোন অসুবিধা দূর করার জন্য সাহায্য চাওয়া। যে সমস্ত সাহায্য শির্কের-পর্যায়ে উহা হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া, যেমন মৃত নবীদের (আঃ) ও আউলিয়াদের (রহঃ) নিকট সাহায্য চাওয়া। অথবা অনুপস্থিত কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া। কারণ, তাদের হাতে না আছে ভাল করার ক্ষমতা আর না আছে ক্ষতি করার ক্ষমতা। এমনকি দোয়াও পর্যন্ত তারা শুনে না। যদিও শুনত তবুও কোন উত্তর দিতে পারত না। এ সমস্ত কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ (সুব) খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ্ (সুব) ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোন ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্ (সুব) আরশের উপর আছেন

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও সহীহ হাদীস এবং সলফে সালেহীনদের কথা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ (সুব) আরশের উপর আছেন।

১. আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "একমাত্র তাঁর নিকটে উত্তম কথা সমূহ উত্তোলিত হয় এবং নেক আমলসমূহও তাঁর নিকট উঠানো হয়।" (সূরা ফাতির ৩৫ঃ ১০)

২. অন্যত্র আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "তিনিই উপরে উঠানোর ক্ষমতার মালিক। তাঁর নিকটেই আরোহন করে ফেরেশতারা এবং রূহ [জিবরিল (আঃ)]।" (সূরা মা'রিজ ৭০ঃ ৩-৪)

৩. আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর।" (সুরা আলা ৮৭ঃ ১)

৪. আল্লাহ্ (সুব) আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ (সুব) আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" (সূরা তাহা ২০ঃ ৫)

৫. ইমাম বুখারী (রহঃ) "ইসতোয়া" শব্দের অর্থ উর্ধ্বারোহণ ও উপরে অধিষ্ঠিত হওয়াকে বলেছেন।

৬. বিদায় হজ্জের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ বলেনঃ *"ওহে! আমি কি তোমাদের নিকট সমস্ত কথা পৌঁছিয়েছি? সাহাবীরা (রাঃ) বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি আসমানের দিকে তর্জনী উঠিয়ে তারপর সাহাবীদের দিকে ইশারা করে বলেছেনঃ হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেক!"* (সহীহ মুসলিম)

৭. রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"আলল্লাহ্ (সুব) এই কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেনঃ যা তাঁর নিকট আছে।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

৮. অন্যত্র রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস কর না। যিনি আসমানের উপর আছেন আমি তাঁর নিকট বিশ্বাসী বলে পরিগণিত। সকাল-সন্ধায় আসমানের খবর আমার নিকট আসে।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

৯. ইমাম আওয়াযী (রহঃ) বলেনঃ আমরা এবং আমাদের সময় যে সমস্ত তাবেয়ীনরা (রহঃ) ছিলেন সকালেই বলতামঃ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আরশের উপর আছেন এবং আমরা তাঁর সিফাতসমূহ যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি।" (বায়হাক্বী সহীহ)

১০.) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ (সুব) আসমানের উপর আরশের উপর আছেন। সেখান থেকে যেভাবে চান সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং তিনি (প্রত্যহ শেষ রাত্রে) দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন যেভাবে খুশি সেভাবে।

১১. ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে, 'আল্লাহ্ (সুব) আসমানে না জমিনে' সে যেন কুফরী করল। কারণ, আল্লাহ্ (সুব) বলেছেন, "আল্লাহ্ (সুব) আরশের উপর আছেন" তাঁর আরশ সাত আসমানের উপরে। তিনি বলেনঃ যদি কেহ বলে, 'হ্যাঁ, সত্যই তিনি আরশের উপর আছেন কিন্তু জানি না আরশ আসমানে না জমিনে', তাহলে ঐ ব্যক্তিও কাফের। কারণ তিনি যে আসমানে আছেন তা সেই ব্যক্তি অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে যে, তিনি আসমানে, সে যেন কুফরী করল। কারণ, আল্লাহ্ (সুব) আলা ইল্লিয়িনে আছেন। তাঁকে আমরা উপরের দিকে হাত তুলে ডাকি, নিচের দিকে নয়। (শরহ আল আক্বীদাহ আততাহাবিয়া)

১২. আর যে ব্যক্তি ইসতোয়াকে বলে ইসতোওলা সে যেন কুরআনের শব্দকে বিকৃত করল। কারণ, সলফে সালেহীনদের কেউ এ কথা বলেন নাই। তাদের রাস্তাই হচ্ছে সর্বোত্তম, গ্রহণযোগ্য। আর ইসতোওলা শব্দের অর্থ হচ্ছে আরশ আল্লাহ্‌র (সুব) দখলে ছিল না, তিনি জোর করে তা দখল করেছেন।

তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা

১. আল্লাহ্ (সুব) এ জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য এবং রাসূলদের পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা তার একত্ববাদের দিকে ডাকে। কুরআনে বেশির ভাগ সূরাতে তাওহীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের উপর শির্‌ক এক ক্ষতিকর দিক। শির্‌কের কারণেই মানুষ দুনিয়াতে ধ্বংস হবে এবং আখেরাতে চিরকালের জন্য আগুনে প্রবেশ করবে।

২. সমস্ত রাসূলগণই সর্বপ্রথম উম্মতের দাওয়াত দেন আল্লাহ্‌র (সুব) একত্ববাদের দিকে। কারণ, আল্লাহ্ (সুব) তাদের হুকুম দেন মানুষদের কাছে এ কথা পৌঁছানোর জন্য। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "তোমার পূর্বে যত রাসূলদের আমি প্রেরণ করেছি তাদের সকলকে অহী মারফত জানিয়েছি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তাই তোমরা সকলে একমাত্র আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ২৫)

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) মক্কার বুকে তের বৎসর অবস্থান করেছেন এবং তিনি তাঁর কওমকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি এবং একমাত্র তাঁর কাছেই দোয়া করার জন্য। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ "বল (হে নবী)! আমি শুধুমাত্র আমার প্রতিপালককে ডাকি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না।।" (সূরা জ্বীন ৭২ঃ ২)

রাসূল (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে ছোট হতেই তাওহীদের উপর গড়ে তুলেছেন।

তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)-কে (যিনি ছোট বালক ছিলেন) ইরশাদ করেনঃ

"যদি কোন কিছু চাও তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাও। যদি সাহায্য চাও, তবে তাঁর নিকটই সাহায্য চাও।" (তিরমিযী, হাসান, সহীহ)। এই তাওহীদই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আর এছাড়া আল্লাহ্ (সুব) কোন কিছুকেই গ্রহণ করবেন না।

৩. আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দেন যে সর্বাগ্রে মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তাই মুয়ায (রাঃ)-কে যখন তিনি ইয়ামানে পাঠান তখন বলেনঃ *"অবশ্যই সর্বপ্রথমে তাদেরকে যে কথার প্রতি দাওয়াত দিবে তা হল এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। অন্যত্র আছে- আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি..."*(সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

৪. তাওহীদ প্রকাশ পায় কলেমা তৈয়্যেবার সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ (সুব) ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নাই এবং রাসূল (সঃ) যে আমল নিয়ে এসেছেন একমাত্র সেই উপায়েই ইবাদত করতে হবে, আর এই কথার সাক্ষ্য দিয়েই কাফেররা ইসলামে প্রবেশ করবে। এ হচ্ছে জান্নাতের চাবি এবং এ কারণেই কলেমাওয়ালা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে শর্ত হল, এমন কোন শির্‌কী কাজ বা কুফরী কথা বলবে না যা তাওহীদকে নষ্ট করে।

৫. মক্কার কাফের কুরাইশরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেছিল রাজত্ব, টাকা-পয়সা, বিয়ে এবং অন্যান্য জিনিস, যা দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দাওয়াত বন্ধ করে দেন এবং মূর্তিদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। বরং তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেও দাওয়াত দিতেই থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাওহীদের জয় হয়। তের বৎসর পর মক্কা বিজিত হয়, মূর্তিদের ভাঙ্গা হয়। তখন রাসূল (সঃ) বলেছিলেনঃ "হক এসে গিয়েছে এবং বাতেল বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় বাতেল বিদায় নিবেই।" (সূরা ইসরা ১৭ঃ ৮১)

৬. একত্ববাদ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের অঙ্গ। তাই জীবন শুরু করবে তাওহীদ দিয়ে এবং শেষ করবে তাওহীদ দিয়ে। সমগ্র জীবনের মধ্যে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তার কাজ এবং সাথে সাথে তার দিকে দাওয়াত দেয়া। কারণ একমাত্র তাওহীদই মু'মিনদেরকে একতাবদ্ধ করতে পারবে এবং তাদেরকে তাওহীদের কালেমার উপর ঐক্যবদ্ধ করবে। আল্লাহ্‌র (সুব) নিকট দোয়া করি, তিনি যেন তাওহীদের কালেমাকে আমাদের শেষ কথা বানান এবং সমস্ত মুসলমানদের তাওহীদের উপরে একত্র করে দেন। আমীন।

তাওহীদের লাভ

১. আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং তা যুলুমের সাথে মিলায়নি তাঁদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তাঁরাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (সূরা আনআম ৬ঃ ৮২)

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ *"যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন মুসলমানরা খুবই কষ্টে পড়েন এবং বলেন আমাদের মধ্যে কে না জুলুম করেনি। তখন আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলেছেনঃ আয়াতের অর্থ ও রকম নয়। বরঞ্চ তা হল শির্‌ক। তোমরা কি লোকমান (আঃ) তার ছেলেকে যা বলেছেন তা শোননি। "হে বৎসৎ! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শির্‌ক করো না, নিশ্চয়ই শির্‌ক করো না, নিশ্চয়ই শির্‌ক মস্ত বড় জুলুম।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২. আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলেনঃ *"ঈমানের ষাটের বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা পড়া এবং নিম্নস্তরের হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলা।"* (সহীহ মুসলিম)

তাওহীদ আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুনাহ মাফ করায়

শেখ আব্দুল্লাহ খৈয়্যাথ 'দালিলুর মুসলিম ফি ই'তিক্কাদ ওয়া তাথহীর' কিতাবে বলেন- মানুষ প্রকৃতিগত কারণে এবং মাসুম না হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে পদলিত হয়। ফলে আল্লাহ্‌র (সুব) বিরুদ্ধে পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়। যদি সে শিরক হতে বেঁচে খালেস তাওহীদের অধিকারী হয়, তবে অবশ্যই তার একত্ববাদ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইখলাস থাকবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মধ্যে। ফলে এটা তার সবচেয়ে বড় কারণ হবে সুখের জন্য এবং তার গুনাহ মাফের জন্য এবং পাপকে দূরীভূত করার জন্য-যা নবী (সঃ)-এর হাদীসে এসেছেঃ *"যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসূল। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দাস এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ঐ কথা যা মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য- তবে তাকে আল্লাহ্‌ (সুব) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমলই করুক না কেন।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই সমস্ত সাক্ষ্য যখন কোন মুসলমান দিবে, তখন তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা ওয়াজিব হবে, যা চিরস্থায়ী নেয়ামতের জায়গা, যদিও তার কোন কোন আমলে দোষ থাকে এবং কমতি থাকে। হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায় আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ *"হে আদমের সন্তান, যদি তুমি কোন শিরক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভরতি পাপরাশি হাজির হও, তবে আমি তোমাকে দুনিয়া ভরতি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।"* (তিরমিযী, হাসান)

অর্থাৎ, যদি আমার কাছে আস দুনিয়া পূর্ণ গুণাহ এবং পাপ নিয়ে, কিন্তু এমতাবস্থায় যে তুমি একমাত্র তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করেছ, তবে আমি অবশ্যই তোমার গুনাহখাতা মাফ করে দিব। অন্য হাদীসে আছেঃ *"যে আল্লাহ্‌র (সুব) সাথে কোন শিরক করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে শিরকের উপরে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"* (সহীহ মুসলিম)

এই সমস্ত হাদীসসমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অসিলা।

তাওহীদের উপকারিতা

মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। ঐ সমস্ত লাভের মধ্যে আছেঃ

১. তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব থেকে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের কাছে নত হওয়া এবং ঐ সমস্ত সৃষ্টি যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের কোন ক্ষমতা নেই নিজেদের ক্ষতি ঠেকাতে বা ভাল করতে, না তারা মৃত্যু দেয়ার অধিকারী, না কবর থেকে বাঁচানোর ক্ষমতার অধিকারী, তাওহীদ ঐ সমস্ত কিছুর ইবাদত করা হতে মানুষকে মুক্তি দেয়; অপরের গোলামী করা হতে বাঁচিয়ে ঐ এক আল্লাহ্‌র দাসত্বে লাগিয়ে দেয় যিনি তার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। তার বুদ্ধিকে নানা ধরনের কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা হতে স্বাধীন করে। তার অন্তরকে অন্যের নিকট নত হওয়া, অপমানিত হওয়া, হতে মুক্তি দেয়। তার জীবনকে ফেরাউনের মত অত্যাচারীদের হাত হতে এবং বিভিন্ন ধরনের নেতা ও জ্বিনপূজক ও মূর্তিপূজকদের হাত হতে স্বাধীন করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে দেখা যায় মুশরিকদের নেতারা ও অজ্ঞ সীমালঙ্ঘনকারীরা সর্বদাই সমস্ত নবীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের রাসূল (সঃ)-এর দাওয়াতের কারণ তারা বুঝত যে যখনই কেউ বলবে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখনই সে মানুষের গোলামী করা হতে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং সে অত্যাচারের বেড়াজাল ছিড়ে ফেলবে, মু'মিনদের কপাল উঁচু হবে এবং তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো কাছে কপাল নত করবে না।

২. তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবনে গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। ফলে তাঁর দিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে মুখ ফেরাতে পারে। সুখে ও দুঃখে তাঁকে ডাকতে পারে। অন্যদিকে মুশরিকদের অন্তর নানা ধরনের প্রভু ও উপাস্যের প্রতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে একবার সে জীবিতদের দিকে মুখ ঘোরায়, আবার সে মৃতদের দিকে মুখ ঘোরায়। এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) বলেছেনঃ

"হে আমার জেলের সাথীদ্বয়! নানা ধরনের রবই উত্তম, না এক আল্লাহ্‌ যিনি একক এবং সর্বোচ্চ শক্তিধর।" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৩৯)

তাই মু'মিন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন। তিনি জানেন কি করলে তার রব খুশী হবেন, আর কি করলে তিনি নারাজ হবেন। তাই যে কাজে তিনি খুশী হন তাই করতে থাকেন। ফলে তার অন্তর শান্ত হয়ে যায়। আর মুশরিক নানা ধরনের উপাস্যের উপাসনা করে। কোনটা তাকে ডানে নিয়ে যায়, কোনটা বামে। আর তার মাঝে পড়ে সে হয় কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এতে তার মনে কোন শান্তি থাকে না।

৩. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তা ভয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দেয়, যেমন রিযিকের ব্যাপারে, জানের ব্যাপারে, পরিজনের জন্য, মানুষ হতে ভয়, জ্বিন হতে, মৃত্যু হতে এবং অন্যান্য ভয়-ভীতি হতেও। একত্ববাদী মু'মিন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অন্যেরা যখন ভয়ের মধ্যে থাকে তখন তাকে দেখবে নির্ভীক। যখন মানুষ চিন্তা পেরেশানীতে জর্জরিত, তখন সে অবিচলিত থাকে। এদিকে নির্দেশ করে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তার সাথে যুলুমকে (শিরককে) জড়িত করেননি, তাদের জন্যই রয়েছে এবং তাঁরাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আনআম ৬ঃ ৮২)

আর এই নিরাপত্তা মানুষের অন্তরে অন্তস্থল হতে নির্গত হয়। কোন প্রহরীর প্রহরায় হয় না। এ হল দুনিয়ার নিরাপত্তা। আর আখিরাতের নিরাপত্তা তো আরও বড় এবং চিরস্থায়ী। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাসের সাথে ইবাদত করেছে এবং তাদের একত্ববাদের সাথে কোন শির্‌ক মিশায়নি। কারণ, শির্‌কই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অত্যাচার।

৪. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ্‌ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়। আলম্নাহ্‌র উপর বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর উপর ভরসা করে, তাঁর বিচারে মন খুশী থাকে, তাঁর হতে প্রদত্ত বিপদে সহ্য ক্ষমতা আসে। সৃষ্টি থেকে সে মুখ ঘুরাতে পারে, সে পাহাড়ের মত অটল হয়ে যায়। যখনই সে কোন বিপদে পতিত হয়, তখনই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। সে কখনও মাজারে মৃতের কাছে ফরিয়াদ করতে যায় না। তাদের নিদর্শন হচ্ছে নবী (সঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসেঃ

"যখন কোন কিছু চাও শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই চাও, যখন কোন সাহায্য চাও তাঁর কাছেই চাও।" (তিরমিযী, হাসান, সহীহ)। তাঁরা সাথে সাথে আল্লাহ্‌র (সুব) ঐ কথার উপর আমল করে-

"যখন আল্লাহ্‌ (সুব) তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করান, তখন তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করার নেই।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১৭)

৫. তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল। কারণ তা কখনই এমন অনুমতি দেয় না যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে একদল লোক অপর দলকে রব হিসেবে মানবে। কারণ, উপাসনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং সমস্ত মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তিনিই রাখেন। আর সমস্ত আবেদদের মুকুট হচ্ছেন মুহাম্মদ (সঃ) যাঁকে আল্লাহ্‌ নির্বাচন করেছেন সকলেই মধ্য হতে।

তাওহীদের শত্রুরা

আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ "এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি মানুষ ও জ্বিনের অন্তর্ভুক্ত শয়তানদের। তারা একে অপরকে সংবাদ দেয় অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং কথাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ধোঁকা দেয়।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১১২)

আল্লাহ্‌র হেকমতের মধ্যে আছে নবী ও একত্ববাদীদের শত্রু জ্বিন শয়তান যারা মানুষ শয়তানদের ওসওয়াসা দিচ্ছে ভ্রান্তির দিকে, খারাপ ও বাতিলের দিকে, যাতে তাদেরকে গোমরাহ করতে পারে, তাদেরকে তাওহীদ হতে সরানোর জন্য যার দিকেই নবীরা সর্বপ্রথম তাদের কওমদের (জাতি) দাওয়াত দিতেন। কারণ, ওটাই হচ্ছে মূল কথা যার উপর ভিত্তি করেই ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেকেই ধারণা করে তওহিদের দিকে দাওয়াত দিলে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, অথচ বাস্তবে ওটাই হল তাদের এক হবার মূল সূত্র। কারণ, নামেই তার পরিচয়। অন্যদিকে যে মুশরিকরা আল্লাহ্‌র (সুব) প্রতিপালকত্বকে স্বীকার করেছিল ও আরো স্বীকার করেছিল যে, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে অস্বীকার করত অথচ এই দোয়াই হচ্ছে ইবাদত। যখন নবী (সঃ) এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর নিকট দোয়া করার দিকে ডাকলেন, তখন তারা নবী (সঃ)- এর সম্বন্ধে বললঃ "সে কি সমস্ত মা'বুদকে এক মা'বুদ বানাতে চায়? আরে এটা তো বড়ই অবাক হওয়ার কথা।" (সূরা ছোয়াদ ৩৮ঃ ৫)

"এমনিভাবে তাদের পূর্বের লোকদের কাছে যত রাসূলই এসেছিলেন তারা তাদেরকে অবশ্যই বলেছে যাদুকর এবং পাগল। তারা কি একে অপরকে উপদেশ দিত? বরঞ্চ তারা ছিল সীমা অতিক্রমকারী দল।" (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫২-৫৩)

মুশরিকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে যখন তাদের কাছে এক আল্লাহ্‌র নিকটে দোয়া করার কথা বলা হত তখন তাদের অন্তর ঘৃণায় ভরে যেত এবং ঐ কথাকে অস্বীকার করত এবং কুফরী করত। আর যখনই কোন শির্‌কের কথা শুনত এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়ার কথা শুনত তখন খুশীতে আত্মহারা হয়ে যেত এবং একে অন্যকে সুসংবাদ দিত। তাদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ

"যখনই এক আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হত তখনই যারা ঈমান আনেনি আখিরাতের উপর তাদের অন্তর অস্থির হয়ে উঠত এবং যখনই তাদের কাছে বলা হত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য মা'বুদদের কথা, তখনই তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে যেত।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ ৪৫)

যারা আল্লাহ্‌র (সুব) একত্ববাদকে অস্বীকার করত আল্লাহ্‌ তা'আলা ঐ মুশরিকদের সম্বন্ধে বলেনঃ

"তার কারণ হল যখনই এক আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা হত তখনই তোমরা তা অস্বীকার করতে এবং যখনই তাঁর সাথে শির্‌ক করা হত, তোমরা তাতেই ঈমান আনতে। এর বিচারের ভার ঐ আল্লাহ্‌র উপর যিনি উচ্চ ও মহান।" (সূরা গাফির ৪০ঃ ১২)

যদিও এই সমস্ত আয়াতগুলো কাফিরদের সম্বন্ধে, তবুও ঐ সকল লোকদের উপরও প্রযোজ্য হবে যারা তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) রং-এ রঞ্জিত, যদিও তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। তাদের অনেকে আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার কথায় ভয় করে। তাওহীদের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে তারা শত্রুতা করে। তাদের উপর নানা অপবাদ দেয় ও নানা ধরনের খারাপ নামে আখ্যায়িত করে, যাতে মানুষেরা তাদের থেকে দূরে সরে যায় এবং মানুষদেরকে সরিয়ে রাখে ঐ তাওহীদ হতে যার জন্য আল্লাহ্‌ (সুব) সমস্ত রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আর যখন শুনে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে রাসূল (সঃ)-এর কাছে, আউলিয়াদের কাছে, তখন তারা নড়ে চড়ে উঠে ও খুশিতে তাদের দিল ভরে ওঠে।

তাওহীদের ক্ষেত্রে আলেমদের ভূমিকা

নিশ্চয়ই আলেমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারেছ। সর্বপ্রথমে নবীগণ যে কথার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তা হল তাওহীদ। ঐ সম্বন্ধে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূলদের এই দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং সমস্ত ধরনের তাগুতদের ডাকা হতে বিরত হও।" (সূরা নাহল ১৬ঃ ৩৬)

তাগুত হচ্ছে তারা- আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় এবং তারা তাতে রাজী খুশী থাকে। এজন্য আলেদের উপর জরুরী হল তারা ওখান থেকেই দাওয়াত শুরু করবে যেখান থেকে সমস্ত রাসূলগণ শুরু করেছিলেন। তারা সকল মানুষকে সমস্ত ইবাদতের মধ্যেই তাওহীদের দিকে ডাকবে। বিশেষ করে দোয়ার মধ্যে। কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ *"দোয়া হচ্ছে ইবাদত।"* (তিরমিযী, হাসান, সহীহ)

আজ বেশিরভাগ মুসলমানই যে শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে তা হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করা। এটাই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। যে কারণে আল্লাহ্ (সুব) আগের যামানার মানুষদের ধ্বংস করেছেন তা হল তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে আউলিয়াদের কাছে দোয়া করত।

তাওহীদের ব্যাপারে এবং শির্কের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আলেমরা কয়েক ভাগে বিভক্তঃ

১. প্রথম দলঃ যারা তাওহীদকে বুঝেছেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেণীসমূহকে বুঝেছেন। সাথে সাথে শির্ককে ও তাঁর শ্রেণীগুলোকেও বুঝেছেন। ফলে তাঁরা তাদের কর্তব্য করতে সোচ্চার হয়েছেন এবং মানুষদেরকে তাওহীদ ও শির্ক বুঝাচ্ছেন। তাঁদের দলিল হল আল-কুরআন এবং সহীহ সুন্নাত। ফলে নবীদেরকে যেমন মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাঁদেরকেও ঐ রকম মিথ্যা অপবাদের স্বীকার হতে হচ্ছে। কিন্তু তারা সহ্য করছেন, তবুও এ কাজ থেকে বিরত হচ্ছেন না। তাদের নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথা যাতে তিনি বলেনঃ

"হে নবী! তারা যাই বলুক না কেন সহ্য করুন এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ করুন।" (সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩ঃ ১০)

এর পূর্বের যামানায় লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেনঃ

"হে আমার সন্তান! সালাতকে কায়েম কর এবং নেক কাজের প্রতি আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং এই পথে যে কষ্ট মুসিবত হবে তার উপর সবর কর; নিশ্চয়ই তা খুবই কঠিন ও বড় কাজ।" (সূরা লোকমান ৩১ঃ ১৭)

২. দ্বিতীয় দলঃ ঐ সমস্ত আলেম যারা ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়াকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। তারা ঘুরে ঘুরে মানুষকে ডাকেন সালাত, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও জিহাদের দিকে, মুসলমানদের আক্বিদা সহীহ না করেই। মনে হয় যেন তারা আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথা শুনেননি-

"যদি তারা শির্ক করে, তবে তারা যত আমলই করুক না কেন তা নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আনআম ৬ঃ ৮৮)

যদি তারা তাওহীদকে অগ্রধিকার দিত যেমন সমস্ত রাসূলগণ দিয়েছেন তবে তাদের দাওয়াত জয়যুক্ত হত এবং আল্লাহ্ (সুব) তাঁদের সাহায্য করতেন। যেমন নবী ও রাসূলদের তিনি সাহায্য করেছেনঃ

"আল্লাহ্র (সুব) ওয়াদা তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অবশ্যই তাঁদের দুনিয়ার বুকে খেলাফত দিবেন যেমন তাঁদের পূর্বে যারা ছিল তাঁদের দিয়েছিলেন। এবং তাঁদের দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যার উপর তিনি রাজী হয়ে গেছেন এবং তাদের ভয়কে বিদূরিত করে তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। ফলে তাঁরা একমাত্র আমার ইবাদত করবে, আর আমার সাথে কোন শির্ক করবে না। এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই হচ্ছে ফাসেক।" (সূরা নূর ২৪ঃ ৫৫)

আল্লাহ্র (সুব) সাহায্য পাওয়ার মূল শর্ত হল তাওহীদের উপর অটল থাকা এবং শির্ক না করা।

৩. তৃতীয় দলঃ আলেমদের এবং ইসলামের পথে আহবানকারীদের মধ্যে তৃতীয় দল হচ্ছে তারা যারা মানুষের শত্রুতার ভয়ে অথবা তাদের চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় বা নিজেদের কেন্দ্রগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেন না এবং শির্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন না। ফলে আল্লাহ্ (সুব) মানুষের কাছে তাবলীগ করার জন্য তাদেরকে যে ইল্ম দান করেছেন তা তারা গোপন করে রেখেছেন।

তাদের জন্য সত্যই আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথা প্রযোজ্যঃ

"নিশ্চয়ই যারা গোপন করে ঐ সমস্ত প্রকাশ্য কথা ও হেদায়েতের কথা যা আল্লাহ্ (সুব) মানুষের জন্য তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, তাদের উপর আল্লাহ্র (সুব) অভিশাপ এবং অভিশাপকারীদের ও অভিশাপ।" (সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৯)

আল্লাহ্ (সুব) দা'য়ীদের (দ্বীনের পথে আহবানকারীদের) সম্বন্ধে বলেনঃ "যারা আল্লাহ্র কথাকে মানুষের কাছে পৌছায়, তারা শুধু তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেই ভয় করে না।" (সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৩৯)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"যে ইলমকে গোপন রাখবে, আলল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিনতার মুখে আগুনের লাগাম পরাবেন।"* (সহীহ, আহমদ)

৪. চতুর্থ দলঃ ঐ আলেম ও বুজুর্গগণ, যারা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র নিকট দোয়া করার বিরোধিতা করেন এবং নবী, আউলিয়া ও মৃতদের কাছে দোয়া করাকে জায়েয বলেন। তারা বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়ার ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তা নাকি শুধুমাত্র মুশরিকদের জন্য এবং মুসলমানদের এমন কেউ নেই যারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যেন আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথা শ্রবণ করে

নাই যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে সামান্যতম কোন শির্ককেই মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং একমাত্র হেদায়েতপ্রাপ্ত।" (সূরা আনআম ৬ঃ ৮২)

এই আয়াত হতে বুঝা যাচ্ছে শির্কের মধ্যে মু'মিন ও মুসলমানও পতিত হতে পারে- যা আজ বেশির ভাগ মুসলমানদের দেশে দেখা যাচ্ছে যারা মানুষের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করাকে এবং মসজিদে কবর দেয়াকে, আর কবরের চারদিকে তওয়াফ করাকে, এমনকি আউলিয়াদের নযর বা মানৎ দেয়াকে এবং অন্যান্য বেদআত ও খারাপ কাজকেও মুবাহ করে দিয়েছে। রাসূল (সঃ) তাদের ব্যাপারে সাবধান করে বলে গেছেন– *"আমি আমার উম্মতের জন্য ভয় পাচ্ছি পথভ্রষ্ট ইমামদের অর্থাৎ আলেমদের গোমরাহীকে।"* (সহীহ, তিরমিযী)

এমনকি এক প্রশ্নের উত্তরে জামেয়া আযহাবের এক শেখ কবরের দিকে সালাত পড়াকে জায়েয বলেন। তিনি বলেনঃ 'কেন কবরের দিকে সালাত পড়া জায়েয হবে না। এই কারণ যে, আল্লাহ্র (সুব) নবী (সঃ) মসজিদে নববীতে শায়িত আছেন এবং মানুষ তাঁর কবরের দিকে সালাত পড়ছে।' কিন্তু প্রথমতঃ নবী (সঃ)-কে মসজিদে দাফন করা হয়নি, বরঞ্চ আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। উমাইয়াদের সময়ে তাঁর কবরকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। অথচ নবী (সঃ) কবরের দিকে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সঃ) দোয়া করেছেন- *"হে আল্লাহ্! আমি ঐ ইল্ম থেকে বাঁচতে চাই যা কোন উপকার দেয় না।"* (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ- যা আমি অপরকেও শিখাব না, না আমি তাতে নিজে আমল করব এবং না তা আমার চরিত্রকে সংশোধন করবে।

৫. ঐ সমস্ত মানুষ যারা তাদের বুজুর্গদের কথাকে মান্য করে এবং আল্লাহ্র (সুব) হুকুম অমান্য করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করে। তারা নবী (সঃ)-এর ঐ কথার উল্টো চলেছে যাতে তিনি বলেনঃ

"স্রষ্টার সাথে পাপের বা অবাধ্যতার কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" (সহীহ, আহমদ)। যার কারণে শীঘ্রই কিয়ামতের দিন তারা আফসোস করবে, যে দিন তাদের ঐ আফসোসে কোন কাজ হবে না। আল্লাহ্ (সুব) কাফেরদের আযাব বর্ণনা করেন এবং যারা তাদের পথ অনুসরণ করবে তাদের সম্বন্ধেও বলেনঃ "যে দিন তাদের মুখ মন্ডলকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আগুনে জ্বালান হবে তখন তারা বলবেঃ হায় আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম এবং রাসূলকেও মানতাম। আরো বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সর্দার ও বড়দের অনুসরণ করেছি, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দাও এবং তাদেরকে খুব বেশি অভিশপ্ত কর।" (সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৬৬-৬৮)

ইব্নে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ আমরা নেতাদের ও বড় বড় বুজুর্গদের অনুসরণ করেছিলাম এবং রাসূলদের বিরোধিতা করেছিলাম এবং এই ধারণা পোষণ করেছিলাম, নিশ্চয়ই তাঁদের কাছে আছে এবং তারাও কোন কিছুর উপর আছে। কিন্তু এখন দেখছি তারা কোন কিছুরই উপরে নেই।

ওহাবী অর্থ কি?

মানুষ আজ ওহাবী বলতে ঐ সমস্ত লোককে বুঝায় যারা সমাজে প্রচলিত অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে চলে- যদিও এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা নিকৃষ্ট এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। আর বিশেষ করে যখন তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং অন্যদের ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে বলা হয় তখনতো কথাই নাই।

লেখক বলেছেনঃ আমি আমার শেখের কাছে ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর ঐ হাদীস পড়ছিলাম-*"রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন কিছু চাও তবে আল্লাহ্র কাছে চাও এবং যদি সাহায্য চাও তবে তাঁর কাছেই সাহায্য চাও।"* (তিরমিযী, সহীহ)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম নওবী (রহঃ) বলেছেন, যদি এমন কোন জিনিস চাও যা মানুষের হাতে নাই যেমন হেদায়েত ও ইল্ম চাওয়া, রোগমুক্তি এবং সুস্থতা- তবে সে একমাত্র তার রবের কাছে চায়। তখন লেখক তাঁর উস্তাদকে বললেনঃ এই হাদীস এবং তার ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়াকে নাজায়েয বলেছে। তিনি বললেনঃ বরং জায়েয। তখন বললামঃ আপনার কি দলিল আছে? এতে শেখ সাহেব খুব রেগে গেলেন এবং চেঁচিয়ে বলতে লাগলেনঃ আমার চাচী এভাবে বলেনঃ হে শেখ সাদ! (যিনি তার ঐ মসজিদের নীচে কবরে আছেন তার নিকট সাহায্য চাইতে)। তখন আমি বললামঃ হে চাচী! তোমাকে কি শেখ সাদ কোন উপকার করতে পারে? উত্তরে বললেনঃ আমি তার কাছে দোয়া করি এবং তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে গিয়ে আমার জন্য শাফায়াত করেন যদিও তিনি মৃত। আমি তখন ঐ শেখকে বললামঃ আপনি জ্ঞানী মানুষ। সারা জীবন কুরআন কিতাব পড়ে কাটালেন। তারপরও কি আপনার আক্বিদা আপনার অজ্ঞ চাচীজানের কাছ থেকে নিবেন? তিনি তখন রেগে বললেনঃ তোমার মধ্যে ওহাবী চিন্তা ভাবনা দেখা যায়। তুমি ওমরা করতে যাও এবং ওহাবীদের কিতাব নিয়ে ফেরত আস। আসলে আমি ওহাবীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না, আমার ওস্তাদদের কাছ থেকে শুধু এতটুকু শুনতাম যে, ওহাবীরা সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা আউলিয়াদের এবং তাদের কারামতের উপর বিশ্বাস করে না এবং তারা রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসে না এবং এই জাতীয় অন্যান্য মিথ্যা তোহমত। তখন মনে মনে বললাম, যদি ওহাবীরা বিশ্বাস করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র (সুব) কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং সুস্থতা দানের মালিক শুধু তিনি, তবে অবশ্যই আমাকে তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। তারপর যখন তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম এবং শুনলাম যে, কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় তারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একত্রিত হয়, তাফসীর, হাদীস এবং ফেকাহ হতে শিক্ষা দেয়ার জন্য। একদিন আমার ছেলেদের এবং অন্য কিছু শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে সেখান গেলাম। তারপর বড় একটা কড়ো প্রবেশ করলাম। তারপরে দারসের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের সামনে এক প্রধান শেখ আসলেন। আমাদের সালাম করেন, তারপর ডান হতে শুরু করে সবার সাথে হাত মিলালেন। তারপর তিনি তাঁর চেয়ারে বসলেন এবং কেউ তাঁর সম্মানে দাঁড়ালেন না। তখন মনে মনে বললাম এই শেখ খুবই নম্র ও বিনীত লোক। তাঁর সম্মানে অন্যদের দাঁড়ানোকে পছন্দ করেন না। তারপর তিনি ঐ খুতবা পড়ে দারস শুরু করেন যা নবী করীম (সঃ) তাঁর খুতবায় ও দারস দেয়ার সময় বলতেন। তারপর আরবী ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন এবং হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন- সহীহ না

দুর্বল তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। যতবারই নবী (সঃ)-এর নাম আসল ততবারই তিনি তাঁর উপর দরূদ পড়লেন। শেষে তাঁর প্রতি লিখিত প্রশ্নাবলী পেশ করা হল। তিনি তার উত্তর দিতে শুরু করলেন কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল দিয়ে। সাথে সাথে উপস্থিত কিছু লোকরা তাঁর সাথে আলোচনাও করতে লাগলেন কিন্তু তিনি কাউকে বিমুখ করলেন না। তারপর দারসের শেষে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র (সুব) যিনি আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিয়েছেন। কিছু লোকেরা আমাদের বলে তোমরা ওহাবী। এটা হচ্ছে মানুষকে দেয়া নিকৃষ্ট উপাধি যার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ নিষেধ করেছেন- "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।" (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ ১১)

অতীতে ইমাম শাফেঈ-কে "রাফেজী" বলে অখ্যায়িত করা হলে তিনি এক কবিতার মাধ্যমে উত্তর দেন, যার সারমর্ম হলঃ যদি নবী (সঃ) এবং তার বংশীয়দের ভালবাসার নাম রাফেজী হয় তবে মানুষ ও জ্বীন সকলে সাক্ষী থেক- আমিও রাফেজী। যখন তিনি দরস শেষ করলেন তখন কিছু সংখ্যক যুবকের সাথে বের হলাম যারা তার ইল্‌ম ও নম্রতায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের একজন বলেই বসলঃ তিনি সত্যই শাঈখ।

ওহাবী বলার ইতিহাস

তাওহীদের শত্রুরা একত্ববাদীদের ওহাবী নামে আখ্যায়িত করে। এতে ইশারা করে মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের প্রতি। যদি তারা সত্যবাদীই হত হবে তাঁর নামের (মুহাম্মদ) সাথে সম্পর্ক করে বলত মুহাম্মদী। কিন্তু আল্লাহ্‌ (সুব) চাইলেন তার নাম ওহাব বা দানওয়ালা এর সাথে সম্পর্কিত হোক। তাই থেকে হল ওহাবী। যদি সুফী বলতে বুঝায় যারা সুফ বা পশমী কাপড় পড়ে তাদের সাথে সম্পর্ক, তবে ওয়াহাবী মানে আল্লাহ্‌র এক নাম ওহাব-এর সাথে সম্পর্ক বুঝায় যিনি মানুষকে একত্ববাদ দান করেন।

তাঁর জীবনী

মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহ্‌হাব সৌদি আরবের অন্তর্গত নজদ এলাকায় 'ওয়াইনাহ' নামক স্থানে ১১১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১০ বৎসর পদার্পণ করার পূর্বেই আল-কুরআন মুখস্থ করেন। তার আব্বা যিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশেষ আলেম ছিলেন তার নিকট হতে ফেকাহ শিখেন। তারপর বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট হতে হাদীস ও তাফসীর শিখেন এবং তারা নানা এলাকা হতে বিশেষ করে মদীনা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেন। ছোট কাল থেকে তার নজরে যে সমস্ত শির্‌ক, বেদআত, কুসংস্কার তিনি তাঁর এলাকায় দেখতেন সেগুলো খুব খেয়াল রাখেন। কবরকে পবিত্র জেনে পূজা করা যা সত্যিকারের ইসলামের বিপরীত। তিনি মাঝে মাঝে শুনতেন তাঁর এলাকার মেয়েরা পুরুষ খেজুর গাছের কাছে অসিলা চেয়ে বলতঃ হে পালের গোদা, বছর পুরার পূর্বে যেন স্বামী পাই। এ ছাড়া তিনি হেজাজে দেখতে পান সাহাবীদের কবরকে পূজা করা হচ্ছে, সাথে সাথে রাসূল (সঃ)-এর বংশধরদের কবরের পূজা করা হচ্ছে যা কিনা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও প্রাপ্য নয়। মদীনায় শুনতেন মানুষ নবী (সঃ)-এর রওজায় গিয়ে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাঁর নিকট বিপদ মুক্তি চাইত এবং দোয়া করত আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যা কিনা কুরআন ও নবী (সঃ)-এর কথার বিপরীত। কারণ আল্লাহ্‌ বলেনঃ

> "আল্লাহ্‌ ছাড়া এমন অন্য কারও কাছে দোয়া করো না যারা তোমার উপকারও করতে পারে না আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি তা কর নিশ্চয়ই তুমি তখন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ১০৬)

নবী (সঃ) ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)-কে একদা বলেনঃ *"যদি চাইতে হয় তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে চাও, আর সাহায্য চাইতে হলে তবে তাঁর কাছে সাহায্য চাও।"* (তিরমিযী, হাসান, সহীহ)

এত সব দেখে তিনি তাঁর এলাকাবাসীদেরকে তাওহীদের দিকে এবং এক আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার দিকে ডাকতে শুরু করলেন। কারণ, তিনিই (সুব) স্রষ্টা এবং সর্বদাতা। অন্যরা কারো কোন কষ্ট দূর করতে সমর্থ নয়, এমনকি তার নিজেরও না। নেককারদের সাথে ভালবাসার অর্থ হল তাদের অনুসরণ করা, তাদেরকে আল্লাহ্‌ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী না বানান। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের কাছে কোন জিনিস না চাওয়া।

১) বাতিল পন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে খাড়া হলঃ যখন তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন বেদ'আতীরা তার বিরুদ্ধে খাড়া হল। এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ নবী (সঃ) যখন একত্ববাদীর দাওয়া নিয়ে খাড়া হলেন তখন মক্কার কাফেররা অবাক হয়ে বলতঃ "সে কি সমস্ত মা'বুদদেরকে এক মা'বুদ বানাতে চায়, এটাতো সত্যিই খুব অবাক হওয়ার কথা।" (সূরা ছোয়াদ ৩৮ঃ ৫)

তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করল। তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরনের মিথ্যা কথার প্রচার শুরু করল- যাতে তারা তাঁর দাওয়াতের হাত থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু আলম্নাহ্‌ (সুব) দাওয়াতের হেফাজত করলেন এবং এমন এক দল লোককে তৈরি করে দিলেন যারা ঐ দাওয়াতের কাজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে হেজাজ ও অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অনেক লোকই তাঁর সম্বন্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলে যে, তিনি পঞ্চম মাযহাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তাঁর মাযহাব হল হাম্বলী। তারা বলেঃ ওয়াহাবীরা রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসে না। তাঁর উপর দরূদ পড়ে না। কিন্তু তিনি রাসূল (সঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'যাদুল মায়'দ'-কে সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাঁর উপরে নানা ধরনের অপবাদ দেয়া হয়। আল্লাহ্‌ (সুব) এ সমস্ত অপবাদের বিচার করবেন কিয়ামতের দিন। যদি তারা তাঁর বইপত্রসমূহকে পড়ত, তবে দেখত– তা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের কথায় পূর্ণ।

২) নবী (সঃ) বলেনঃ *"হে আল্লাহ্‌! বরকত দাও আমাদের শামে এবং ইয়ামানে। লোকেরা বললঃ আমাদের নজ্‌দে। তিনি বললেনঃ ওখানে ভূমিকম্প ও ফেতনা দেখা দিবে। ওখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইব্নে হাজার আসকালানী ও অন্যান্য আলেমরা বলেছেনঃ হাদীসে যে নজ্দের কথা বলা হয়েছে তা ইরাকে। কারণ, সেখান থেকেই ফেতনা শুরু হয়েছে। সেখানে হোসেন (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়। কিন্তু কিছু লোক মনে করে নজদ হল হেজাজের নজদ।

কিন্তু ইরাকে যে ধরনের ফেতনা প্রকাশ পায় ঐ রকম কোন ফেতনা সৌদি আরবের নজদ থেকে প্রকাশ পায়নি। হেজাজের নজদ থেকে ঐ তাওহীদ প্রকাশ পায় যে তাওহীদের জন্য আল্লাহ্ (সুব) বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য সমস্ত রাসূলদের (আঃ) প্রেরণ করেছেন।

৩) কিছু ন্যায়পরায়ণ আলেম বলেছেন যে, তিনি হিজরী ১১ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে শেখ আলী আল তানভাভী (রহঃ) যিনি বড় বড় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তার মধ্যে শেখ মোহাম্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াহ্হাব। তাতে বলছেন, একত্ববাদ ধ্যান-ধারণা হিন্দুস্তান এবং অন্যত্র পৌঁছেছেন মুসলিম হাজীদের দ্বারা যারা মক্কা থেকে এই সম্বন্ধে ধারণা নিয়েছেন। ফলে ইংরেজরা ও ইসলামের শত্রুরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। কারণ, তাওহীদই মুসলমানদেরকে একত্রীভূত করে শত্রুদের বিরুদ্ধে। ফলে তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করল যে, যে ব্যক্তিই তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকে তাকেই তারা 'ওয়াহাবী' নামে আখ্যায়িত করতে শুরু করল। এতে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানরা যেন ঐ 'তাওহীদ' থেকে দূরে সরে যায় যা এক আল্লাহ্র কাছে দোয়া করার কথা শিক্ষা দেয়।

তাওহীদ ও শির্কের দ্বন্দ্ব

১) তাওহীদ ও শির্কের মধ্যে যুদ্ধ বহু পুরাতন। নূহ (আঃ) মূর্তি পূজা ছাড়াতে যখন তাঁর জাতিকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাকছিলেন তখন থেকেই তা শুরু হয়। তিনি এভাবে সাড়ে ন'শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত দেন। তারা যেভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে সে সম্পর্কে কুরআন বলেঃ "তার কওমের নেতারা বললঃ তোমরা কখনও তোমাদের দেবদেবীদের ছেড় না, না "ওদ্দা", "সূয়া'য়", "ইয়াগুছা", "ইয়া'য়ুকা" বা "নাছরা"কে, যদিও এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে।" (সূরা নূহ ৭১ঃ ২৩-২৪)

সহীহ বুখারীতে ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ এরা ছিলেন নূহ (আঃ)-এর জাতির মধ্যে ভাল ও নেককার লোক। যখন তারা মারা গেলেন তখন শয়তান তাদের জাতির লোকদের কাছে গোপনে বলল, তারা যেখানে বসত সেখানে তাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করতে এবং তাদেরকে তাদের নামে বিভূষিত করতে। তারা তা করল। কিন্তু তখন পর্যন্তও তাঁদের ইবাদত করা হত না। যখন এই লোকেরা মারা গেল তখন কেন যে মূতিগুলো বানানো হয়েছিল তা লোকেরা ভুলে গেল; ফলে তখন থেকেই মূর্তি ও পাথরের পূজা শুরু হয়ে গেল।

২) তারপর নূহ (আঃ)-এর পর যত রাসূলগণ (আঃ) এসেছিলেন প্রত্যেকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাকতে শুরু করলেন এবং ঐ সমস্ত মা'বুদদের ত্যাগ করতে বললেন যাদের ইবাদত করা হত আল্লাহ্কে ছেড়ে আর যারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

আল-কুরআন এই খবরে ভরপুর। আল্লাহ্ বলেনঃ "আ'দ জাতির কাছে আসলেন তাদের ভাই হুদ (আঃ)। তিনি তাদের দাওয়াত দিয়ে বললেনঃ হে আমার জাতি, এক আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি পরহেজগার হবে না?" (সূরা আরাফ ৭ঃ ৬৫)

অন্যত্র বলেনঃ "সামুদ জাতির কাছে এসেছিলেন তাদের ভাই সালেহ (আঃ)। তিনি এই দাওয়াত দিতেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ্র (সুব) ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই।" (সূরা হুদ ১১ঃ ৬১)

"মাদায়েনে আসলেন তাদের ভাই শুয়াইব (আঃ)। তিনি তাদের বললেনঃ হে আমার জাতি, আল্লাহ্র (সুব) ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।" (সূরা হুদ ১১ঃ ৮৪)

"যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা এবং জাতির লোকদের বললেন, অবশ্যই আমি ওদের থেকে সম্পর্কমুক্ত যাদের ইবাদত তোমরা কর। আমি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন।" (সূরা যুখরুফ ৪৩ঃ ২৬-২৭)

মুশরিকরা সমস্ত নবীদের বিরোধিতা করত এবং অহঙ্কারের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিত। সাথে সাথে তাঁরা যে সমস্ত দাওয়াত নিয়ে আসতেন তার বিরুদ্ধেও যত ধরনের শক্তি তাদের ছিল তা দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা করত।

৩) এই আমাদের রাসূল (সঃ) যিনি আরবদের কাছে নবুয়ত পাওয়ার আগে বিশ্বাসী আল-আমীন বলে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখনই তাদের এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাকলেন এবং ঐ সমস্ত মূর্তির ইবাদত না করতে বললেন যা তাদের বাপ দাদারা করত, সাথে সাথে তারা তাঁর সত্যবাদীতা ও আমানতদারী ভুলে গেল। আর বলতে শুরু করলঃ তিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যাদুকর। এই কুরআন তাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেঃ

"যখনই তাদের মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শক আসলেন তখনই তারা অবাক হয়ে গেল, ফলে কাফেররা বলতে লাগলঃ এ যাদুকর এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে কি আমাদের সমস্ত মা'বুদদের এক মা'বুদ বানিয়ে ফেলতে চায়, এ তো বড়ই অবাক হওয়ার কথা।" (সূরা ছোয়াদ ৩৮ঃ ৪-৫)

অন্যত্র বলেনঃ "এভাবে যত রাসূল তাদের পূর্বে এসেছেন তাদেরকে তারা অবশ্যই বলেছে যাদুকর এবং পাগল। তারা কি একে অপরকে এই ব্যাপারে উপদেশ দিত? বরঞ্চ তারা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫২-৫৩)

এই হচ্ছে সমস্ত রাসূলের তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার পরের অবস্থা। এটাই হচ্ছে তাঁদের মিথ্যাবাদী কওম ও অপবাদ দানকারীদের ভূমিকা।

৪) আর আমাদের এই সময়ে যখন কোন মুসলমান তাদের ভাইদের দাওয়াত দেয় চরিত্র সংশোধন করতে, সত্য কথা বলতে এবং আমানতদারী ঠিক করতে, তখন তাতে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। আর যখনই ঐ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করে যার দিকে সমস্ত রাসূলরা দাওয়াত দিয়েছেন, আর তা হল এক আলম্নাহর কাছে দোয়া করা এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য নবী এবং আউলিয়া (যারা আল্লাহ্‌র দাস) এদের কাছে দোয়া করতে নিষেধ করা, তখনই মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদে জর্জরিত করতে থাকে। তাকে বলে, ইনি 'ওহাবী'-যাতে মানুষ তাঁর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যখন কুরআনে কোন তাওহীদের আয়াত আসে তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ হল ওহাবীদের আয়াত। আর যখন হাদীস বলেঃ *'যখন সাহায্য চাও তখন এক আল্লাহ্‌র কাছে চাও'*, তখন কেউ কেউ বলেঃ এ হল ওহাবীদের হাদীস। যখন কোন মুসল্লী বুকের উপর হাত বাঁধে এবং আত্তাহিয়াতুতে তর্জনি নাড়ে যা রাসূল (সঃ) সর্বদা করতেন তখন লোকে তাকে বলেঃ এ ওহাবী হয়ে গেছে। আজ ওহাবী তাকেই বলা হয় যে একত্ববাদী এবং এক আল্লাহ্‌কে ডাকে এবং সাথে সাথে নবী রাসূল (সঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে।

৫) যারা তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকবে তাঁদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। এবং ঐ রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে যাঁকে তার বর বলেছেনঃ "তারা যা বলে তা তুমি সহ্য কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ কর।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ৭৩ঃ ১০)

অন্যত্র আয়াতে বলেনঃ "তারা যা বলল তা সহ্য করতে থাক এবং তাদেরকে পাপের বা কুফরী কার্যে অনুসরণ কর না।" (সূরা ইনসান ৭৬ঃ ২৪)

৬) মুসলমানদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে তাওহীদের দিকে যে দাওয়াত দেয়া হয় তাকে কবুল করা এবং ঐ দাওয়াতকে ভালবাসা। কারণ, তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া সমস্ত রাসূলদের কাজ ছিল এবং আমাদের রাসূল (সঃ)-এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। যে নবীকে ভালবাসে অবশ্যই সে তাঁর দাওয়াতকে ভালবাসবে। যে তাওহীদকে ঘৃণা করল সে যেন নবী রাসূল (সঃ)-কেই ঘৃণা করল। আর কোন মুসলমানই কি এ কাজ করতে রাজী হবে?

হুকুম আহকাম শুধু আল্লাহ্‌ হতে

আল্লাহ্‌ (সুব) এই জগৎ -কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর সেটা তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের উপর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সত্য ও ন্যায় বিচারের সাথে মানুষদের মধ্যে বিচার করা হয়। এই বিচার পাওয়া যায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথার মধ্যে। এই হুকুম আছে ইবাদতের মধ্যে, বেচাকেনার মধ্যে ও আক্বিদার ক্ষেত্রে, শরীয়তের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে এবং অন্যান্য মানবীয় কার্যের মধ্যে।

১) আক্বিদার ক্ষেত্রে হুকুমঃ সর্বপ্রথমে সমস্ত নবী রাসূল (আঃ) যে কার্য শুরু করেন তা হল আক্বিদা শুদ্ধ করা এবং মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া। লক্ষ্য করুন, ইউসুফ (আঃ) জেলখানার ভিতরে তাঁর দুই সঙ্গীকে দাওয়াত দিচ্ছেন তাওহীদের দিকে যখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দোয়ার পূর্বেই তিনি তাদের বললেনঃ

"হে আমার জেলের সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক কি ভাল, না কি এক আল্লাহ্‌ যিনি একক এবং প্রচন্ড শক্তিধর? তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যে সমস্ত জিনিসের ইবাদত করছ তারা শুধু নাম মাত্র, যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা নামাঙ্কিত করেছ। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌ (সুব) কোন নিদর্শন ও হুকুমই পাঠাননি। সমস্ত হুকুমই এক আল্লাহ্‌ হতে। তিনি হুকম করেছেন তাঁর ইবাদত করতে। তা-ই হচ্ছে আসল দ্বীন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরাই তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৩৯-৪০)

২) ইবাদতের ক্ষেত্রে হুকুমঃ আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে ইবাদতের হুকুম আহকাম গ্রহণ করা। যেমন সালাত, যাকাত, হজ্জ এবং অন্যান্য ইবাতসমূহ পবিত্র কুরআন হতে এবং সহীহ হাদীস হতে নবী (আঃ)-এর কথার উপর আমল করেঃ

"তোমরা ঐভাবেই সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র বলেনঃ *"তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী আমার নিকট হতে গ্রহণ কর।"* (সহীহ মুসলিম)

এবং চার মাযহাবের ইমামরাই বলেছেন, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে তাই আমাদের মাযহাব। যদি কোন মাসলায় তাদের মধ্যে কোন মতভেদ হয়, তবে কোন এক ইমামের কথা নিব না, বরঞ্চ যার খাতায় সহীহ হাদীস হতে দলীল আছে তারটাই গ্রহণ কর।

৩) বেচাকেনার মধ্যে হুকুম আহকামঃ ধার ও কর্য, ভাড়া দেয়া এবং অন্যান্য কাজ, এগুলির মধ্যে এক আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম চলবে। কারণ, আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ

"কখনো না, তোমার রবের শপথ, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে বিচারক বানাবে ঐ সমস্ত বিবাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে ঘটছে। তারপর যখন বিচার করে দিবে তখন তারা তাদের অন্তরে এই ব্যাপারে কোন কষ্ট অনুভব করবে না বরঞ্চ যা তুমি বিচার করে দিয়েছ তাকে সুন্দরভাবেই গ্রহণ করবে।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৬৫)

তাফসীরকারগণ এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ স্বরূপ বলেছেনঃ তা হল দুই সাহাবীর মধ্যে জমিতে পানি সেচ দেয়া নিয়ে মত বিরোধ ঘটে। তখন নবী (সঃ) জুবাইর (রাঃ)-কে সেচের হুকুম দেন। তখন অন্য ব্যক্তি বললঃ তার ব্যাপারে আপনি রায় দিয়েছেন কারণ, সে আপনার ফুপুর ছেলে। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী)

৪) বিচার ও কিসাসের ক্ষেত্রে হুকুমঃ আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) লিখেছি জানের বদলে জান এবং চোখের বদলে চোখ এবং নাকের বদলে নাক ও কানের বদলে কান। আর যারা আল্লাহ্ (সুব) হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার দ্বারা বিচার করে না তারাই হচ্ছে জালেম বা অত্যাচারী।" (সূরা মায়িদা ৫ঃ ৪৫)

৫) শরীয়তের ক্ষেত্রে এক আল্লাহ্র হুকুমঃ আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমাদের জন্য দ্বীনের ঐ সমস্ত ব্যাপারগুলোকে নির্দেশিত করেছেন যার ব্যাপারে নূহ (আঃ)-কে উপদেশ দিয়েছেন এবং যা আমি তোমাকেও ওহীর দ্বারা নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ১৩)। সাথে সাথে আল্লাহ্ (সুব) মুশরিকদের ঐ কথার বিরোধিতা করেন যে, তিনি বিচারের ভার আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের হাতে দিয়েছেন। তাই বলেনঃ "তাদের কি কোন শরীকদার আছে যারা তাদের জন্য ঐ হুকমসমূহ তৈরী করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্ (সুব) দেন নি।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ২১)

মূল কথা

১) মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে কুরআন ও সহীহ সুন্নাত মত বিচার করা এবং একে অপরের মধ্যে তাদের দ্বারাই বিচার সম্পাদন করবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ্র (সুব) কথার উপর আমল করেঃ

"তাদের মধ্যে আল্লাহ্ হতে অবতীর্ণ কথায় বিচার কর।" (সূরা মায়িদা ৫ঃ ৪৯)

রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"যখন নেতারা আল্লাহ্ হতে অবতীর্ণ শরীয়তের দ্বারা বিচার করবে না ও তার মধ্য হতে নিজেদের পছন্দ মত কথার দ্বারা বিচার করবে, তখন আল্লাহ্ (সুব) অবশ্যই তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করে দিবেন।"* (হাসান, ইব্নে মাজা)

২) মুসলমানরা বিদেশীদের ঐ আইনকে বাতিল করবে যা উপনিবেশ শাসকরা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় যখন তারা মুসলমানের দেশ বহু দিন ধরে শাসন করে। যেমন, ইংরেজ ও ফ্রান্সের আইন এবং অন্যান্য আইন যা ইসলামের হুকুমের বিরোধিতা করে এবং যা তাদের দুর্ভাগ্যের এবং পিছিয়ে যাবার কারণ।

৩) মুসলমানদের ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্মান হবে না এবং সাহায্যও পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অত্যাচারী আইনকে বাতিল করবে এবং ইসলামের হুকুমে ফেরত আসবে। মুসলমানেরা সাহায্য তখনই পাবে যখন তারা জীবনের মধ্যে শরীয়তকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। আবার মুসলমানরা তখনই সাহায্য পাবে যখন আল্লাহ্র (সুব) ন্যায্য বিচারকে গ্রহণ করবে এবং মুসলমান ও অন্যদের জন্য ন্যায় পরায়ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

আক্বিদা আগে না হুকুমত আগে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেন প্রখ্যাত দ্বীনের দা'য়ী শেখ মোহাম্মাদ কুতুব মক্কায় দারুল হাদীস মাদ্রাসায়। নিম্নে প্রশ্নটা দেয়া হলঃ

প্রশ্নঃ কিছু লোক বলেনঃ নিশ্চয়ই ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হত ইসলামী হুকুমত তৈরি হলে এবং অন্যেরা বলেনঃ ইসলাম আবার তাজা হবে যদি আক্বিদাকে সহীহ করার মেহনত করা হয় তবেই, আর সাথে সাথে জামাত গঠনের মাধ্যমে। এদের কোনটা সত্য?

উত্তরঃ কোত্থেকে এ দ্বীনের জন্য দুনিয়ার বুকে হুকুমত কায়েম হবে যদি না দা'য়ীরা মানুষের আক্বিদা সংশোধন না করেন এবং সত্যিকারের ঈমান না আনেন। দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হলে সবর না করেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ না করেন। তখনই আল্লাহ্র (সুব) দ্বীন মোতাবেক দুনিয়াতে শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এটাতো খুবই পরিষ্কার ব্যাপার। হুকুমত কখনই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না, না কেউ তা অবতীর্ণ করাতে পারবে। সমস্ত জিনিসই আকাশ থেকে আসে কিন্তু ত্যাগ তিতীক্ষা, কষ্ট ও মেহনতের মাধ্যমে। এটা আল্লাহ্ (সুব) বান্দাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

"যদি আল্লাহ্ (সুব) চাইতেন, তবে সহজেই তিনি তাদের সাহায্য করতেন কিন্তু তিনি চান তোমাদের মধ্য হতে একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ ৪)

তাই আমাদের অবশ্যই শুরু করতে হবে আক্বীদা সহীহ করার দ্বারা এবং সমাজকে গঠন করে তুলতে হবে সত্যিকারের আক্বিদার উপর। যারা মেহনত শুরু করবে ঐ দল পরিক্ষীত হবে এবং তাদেরকে সবর করতে হবে ঐ পরীক্ষার উপর। যেমন প্রথম জামানায় সাহাবীদের দল সেগুলো সহ্য করেছেন।

বড় শির্ক এবং তার শ্রেণী বিভাগ

বড় শির্কের অর্থ হচ্ছে কাউকে আল্লাহ্র (সুব) সমকক্ষ বানানো। তাঁকে ওমনিভাবে ডাকা যেভাবে আল্লাহ্কে ডাকা হয়। অথবা তার জন্য কোন ধরনের ইবাদত নির্দিষ্ট করা। যেমন সাহায্য চাওয়া অথবা যবেহ করা অথবা নজর নেয়াজ দেয়া বা মানৎ করা অথবা অন্যান্য ইবাদত।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেন, নবী (সঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলামঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? তিনি বললেনঃ *"ঐ আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ বানানো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

বড় শির্কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ

১) দোয়ার মধ্যে শির্কঃ তা হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা যেমন নবীদের বা আউলিয়াদের কাছেঃ রিযিকের জন্য, রোগ মুক্তির জন্য। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ "তুমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য এমন কাউকে ডেকো না, যে না তোমার উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে। যদি তা কর তবে তুমি নিশ্চয়ই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ১০৬)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"কেউ ঐ অবস্থায় মারা গেল যে সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হিসাবে মানত তবে সে আগুনে প্রবেশ করবে।"* (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করা শির্ক। যেমন মৃতদের ও আউলিয়াদের কাছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

"তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছ তারা এতটুকু জিনিসের অধিকারী নয়, যদিও তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের দোয়া শুনেই না, যদি শুনতও কখনো উত্তর দিতে পারত না এবং কিয়ামতের দিন তারা তাদের সাথে শির্ককারীদেরকে অস্বীকার করবে এবং সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।" (সূরা ফাতির ৩৫ঃ ১৩-১৪)

২) আল্লাহ্র গুণের মধ্যে শির্কঃ তা হল এই বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই নবীগণ অথবা আউলিয়াগণ গায়েব জানেন।

"এবং তাঁর নিকটেই গায়েবের চাবিকাঠিসমূহ আছে, যার তা (গায়েব) তিনি ছাড়া কেউ জ্ঞাত নয়।" (সূরা আনআম ৬ঃ ৫৯)

৩) মহব্বতের ক্ষেত্রে শির্কঃ কোন ব্যক্তি অথবা আউলিয়াকে আল্লাহ্কে ভালবাসার মত ভালবাসা। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "মানুষের মধ্যে অনেকে আছে যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যদের আল্লাহ্র সমকক্ষ বানিয়ে নেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্কে ভালবাসার মত ভালবাসে এবং যারা ঈমানদার আল্লাহ্র (সুব) জন্যই তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশি।" (সূরা বাকারা ২ঃ ১৬৫)

৪) আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্কঃ তা হল পাপের ক্ষেত্রে কোন আলেম বা কোন পীরের আনুগত্য করা- এ ধারণা করে যে, তারা ঠিকই করছে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "(তারা খৃষ্টানরা) তাদের আলেম ও আবেদদেরকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্কে ছেড়ে।" (সূরা তওবা ৯ঃ ৩১)

এই ইবাদতের ব্যাখ্যা হল তারা পাপের ক্ষেত্রেও তাদের আনুগত্য করত, যার মধ্যে ছিল আল্লাহ্র (সুব) নির্দেশিত হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল করা (সহীহ আহমদ)। রাসূল (সঃ) বলেনঃ *"সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না স্রষ্টার সাথে কোন পাপ কার্যে।"* (সহীহ, আহমদ)

৫) হলুলের ক্ষেত্রে শির্কঃ তা হল এই ধারণা করা যে, আল্লাহ্ (সুব) তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। এটা অনেক সূফী পীরদের ধারণা। তাদের মধ্যে ইব্নে আরাবী যিনি বলেনঃ প্রতিপালকই দাস এবং দাসই রব; হায় তবে কি লাভ হবে সালাত, রোযার। অন্য একজন বলেনঃ কুকুর, শুকুরও আল্লাহ্ ছাড়া কিছু না, আর মন্দিরের পাদ্রীও আল্লাহ্। (নাউজুবিল্লাহ)

৬) দুনিয়া চালনার ক্ষেত্রে শির্কঃ এই বিশ্বাস করা যে, কোন কোন আউলিয়া আছেন যারা এই সৃষ্টি জগতকে পরিচালনা করেন। তাদেরকে কুতুব বলা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ (সুব) পুরাতন জামানার মুশরিকদের প্রশ্ন করেনঃ

"এবং যদি প্রশ্ন কর সমস্ত কাজ কে পরিচালনা করেন? তখন তারা সাথে সাথে উত্তর দেবে, আল্লাহ্।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ৩১)

৭) বিচারের ক্ষেত্রে শির্কঃ তা হল ইসলাম বিরোধী আইন বানানো এবং তাকে জায়েয মনে করা। অথবা এই মনে করা যে, এই জামানায় ইসলামী আইন চলতে পারে না। এর ভিতরে প্রজা ও রাজা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।

৮) বড় শির্ক মানুষের সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "অবশ্যই আমি তোমার কাছে এবং যারা (নবীরা) তোমার পূর্বে ছিল তাদের কাছে এই ওহী পাঠিয়েছি যদি কোন শির্ক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ ৬৫)

৯) বড় শির্ককে আল্লাহ্ (সুব) তওবা ছাড়া মাফ করেন না। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহকে ক্ষমা করবেন না এবং তাছাড়া অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করবেন যাকে খুশী তাকে এবং আল্লাহ্র সাথে কোন শির্ক করে নিশ্চয়ই সে বিরাট গোমরাহীর মধ্যে আছে।" (সূরা নিসা ৪ঃ ১১৬)

১০) শির্কের অনেক শ্রেনী বিভাগ আছে। তার মধ্যে কোনটা বড়, কোনটা ছোট শির্ক। সকলের উপর ওয়াজিব হল এগুলো হতে সাবধান থাকা এবং আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেনঃ *"হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে ঐ শির্ক থেকে বাঁচতে চাই যা আমরা জানি এবং যা আমরা জানি না তা হতে মাফ চাই।"* (হাসান, আহমদ)

যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে ডাকে তাদের উদাহরণ

"হে মানুষরা একটা উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, খুব ভাল করে শুন। তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছে কখনোই তারা একটা মাছিকে পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয় এর জন্য এবং যদি কোন মাছি তাদের কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তারা সকলে মিলে তার থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় এবং যার কাছে চায় উভয়কেই দুর্বল করা হয়েছে।" (সূরা হজ্জ ২২ঃ ৭৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ (সুব) সমস্ত মানুষদের সম্বোধন করে বলেছেন এই বিরাট উদাহরণ শোনার জন্য এই বলে যে, এই মস্ত আউলিয়া বা নেককার ব্যক্তিরা যাদেরকে তোমরা তাদের মৃত্যুর পর ডাকছ যাতে তারা তোমাদের সাহায্য করে, কখনোই তারা তা করতে সমর্থ হবে না বরং তারা এতই অপারগ যে সৃষ্টির সামান্য একটি সৃষ্টি মাছিকেও বানাতে পারে না। আর যদি কোন মাছি তাদের কোন খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় নিয়ে যায় কখনোই তা সেটা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এটা তাদের দুর্বলতার প্রমাণ এবং মাছিরও দুর্বলতা। তাহলে কেমন করে তাদেরকে ডাক আল্লাহ্কে ছেড়ে। এই উপমায় যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে কোন নবী বা ওলীদের ডাকে, আল্লাহ্ (সুব) তাদের প্রচন্ডভাবে নিষেধ করেছেন তা করতে।

তার কাছাকাছি উপমা হলঃ আল্লাহ্ বলেনঃ "তাঁর জন্যই সত্যিকার দোয়া। এবং যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে তারা কখনই তাদেরকে কোন ব্যাপারে উত্তর দিবে না যেমন কেউ তার দু'হাতকে পানির দিকে প্রসারিত করেছে যাতে পানি তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু তা কখনই পৌঁছবে না। আর তাইতো কাফেরদের দোয়া ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা রাদ ১৩ঃ ১৪)

এই আয়াত থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, দোয়া হল ইবাদত- তা হল শুধু আল্লাহ্র জন্য। ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকছে তাঁদের কাছ থেকে তারা কোন উপকার পায় না এবং কোন ব্যাপারেই তারা তাদের উত্তর দিবে না। এ উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আছে তার হাত দিয়ে পানি করার জন্য কিন্তু তা কখনোই পারবে না। মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, মুখের সাহায্য পানিকে ডাকছে এবং তার দিকে ইশারা করছে কিন্তু তা কখনোই তার কাছে আসবে না– (ইব্নে কাসীর)। তারপর আল্লাহ্ (সুব) ওদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে ডাকে এবং বলেছেন তাদের দোয়াও ব্যর্থ।

তাই, হে আমার মুসলাম ভাই। আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের কাছে দোয়া করা হতে সাবধান হও। এর ফলে কাফের ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ্কে ডাক যিনি সর্বময় কর্তা। যাতে করে তুমি মু'মিন ও একত্ববাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার।

কিভাবে আমরা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত হব

আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা হতে বিরত থাকা কখনই পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তিন ধরনের শির্কের বাদ দিব।

১) রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শির্কঃ এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্র (সুব) সাথে অন্য স্রষ্টা এবং পরিচালক আছে। যেমন কতিপয় পীর মনে করে থাকে যে, আল্লাহ্ (সুব) দুনিয়ার কিছু কাজ কারবারকে কোন কোন আউলিয়ার হাতে সোপর্দ করেছেন, তারাই তা নির্বাহ করে থাকেন, যেমন কুতুবরা। এই ধারণা ইসলামের পূর্বের মুশরিকরা পর্যন্ত করে নাই যখন কুরআন তাদের প্রশ্ন করেঃ

"আর কে সমস্ত কাজ দেখাশুনা করে, তারা বলবে যে, আল্লাহ্।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ৩১)

লেখক বলেন, এক সূফী বলেছেনঃ আল্লাহ্র এমন বান্দাও আছে যদি সে বলে, হও, সাথে সাথে তা হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআন তাদেরকে এই বলে মিথ্যাবাদী বলে যেঃ

"যখনই তিনি (আল্লাহ্) কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন- হও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াছিন ৩৬ঃ ৮২)

এবং আল্লাহ্ বলেনঃ "ওহে তাঁরই সৃষ্টি এবং হুকুমত।" (সূরা আরাফ ৭ঃ ৫৪)

২) ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্কঃ তা হল আল্লাহ্র সাথে অন্যের ইবাদত করা, যেমন নবীদের এবং নেককার বান্দাদের। যেমন তার অসিলায় বিপদ মুক্তি চাওয়া এবং বিপদে পড়ে তাদের কাছে দোয়া করা এবং এই জাতীয় কার্য। বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, এসব এই উম্মতের মধ্যে অনেক আছে এবং এ বিশেষ পাপ ঐ সমস্ত পীররা গ্রহণ করবে যারা এই জাতীয় শির্ককে সাহায্য করে। অসিলা খোঁজার নামে তাকে অন্য নামে বিভূষিত করে। কারণ অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্র কাছে কোন মাধ্যমকে খোঁজা। যেমন লোকেরা বলে যে, আল্লাহ্র রাসূল সাহায্য করুন, হে আবদুল কাদের জিলানী সাহায্য করুন। আর এই চাওয়াটা ইবাদত। কারণ তা হল দোয়া এবং দোয়া হল ইবাদত।

৩) তাঁর গুণের মধ্যে শির্কঃ তা হল তাঁর কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত করা যা শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। যেমন গায়েব (ভবিষ্যত) এর ইল্ম জানা। এই দলের মধ্যে অনেক পীররা অন্তর্ভুক্ত এবং যারা তাদের সাথে জড়িত আছে। যেমন বুছাইরী নবী (সঃ)-এর প্রশংসাতে বলেনঃ হে নবী (সঃ)-এর প্রশংসাতে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার দয়াতেই দুনিয়ার ভাল, আর মন্দও তোমা হতে এবং তোমার ইল্ম হতেই কলম ও লওহে মাহ্ফুজের ইল্ম। এর থেকে পথভ্রষ্ট চরম মিথ্যাবাদীদের কথা এসেছে যারা ভুল ধারণা পোষণ করে যে, নবী (সঃ)-কে তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাঁকে ঐ সমস্ত গোপন (বাতেন) জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যা তারা জানে না। ঐ সমস্ত লোকদের গোপন কথা যাদের সাথে তারা ভালবাসা করে এবং যাদের কোন কোন কার্যে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায়। এমনকি ঐ কথাও যা নবী (সঃ) তাঁর জীবিত অবস্থাতেও জানতেন না। যেমন আলস্নাহ্ নবী (সঃ)-এর ব্যাপারে বলেনঃ

"যদি আমি গায়েব জানতাম তবে ভালকেই বাড়িয়ে নিতাম এবং কোন ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আ'রাফ ৭ঃ ১৮৮)

আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি তাঁর ওফাতের পর এই গায়েবকে জানেন যখন তিনি তাঁর উপরের বন্ধুর কাছে চলে গেছেন।

একদা নবী (সঃ) শুনলেন একটা বাচ্চা মেয়ে বলছেঃ এবং আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকালের কথা জানেন। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ *না, এ কথা বল না, ঐ কথাই বল যা বলছিলে।"* (সহীহ বুখারী)

একত্ববাদী কে?

যে ব্যক্তি এই তিন শ্রেণীর শির্ককে আল্লাহ্ হতে বাদ দেয় তাঁর একত্ববাদের মধ্যে এবং তাঁকে এক বলে মানে তাঁর সত্ত্বার মধ্যে ও ইবাদতের মধ্যে, দোয়ার মধ্যে এবং তাঁর গুণাবলীর মধ্যে সেই হচ্ছে একত্ববাদী। ঐ সমস্ত গুণাবলী হচ্ছে একত্ববাদীদের বৈশিষ্ট্য। যে এই শির্ক তিনটার কোনটিকে স্বীকার করে সে আর একত্ববাদী থাকল না, বরঞ্চ তার উপর আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথাই প্রযোজ্য হবেঃ "যদি তুমি শরীক কর তবে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ ৬৫)

ছোট শির্ক ও তাঁর শ্রেণী বিভাগ

তা হল ঐ সমস্ত রাস্তা যা মানুষকে বড় শির্কের নিকটবর্তী করে দেয় কিন্তু যা ইবাদত পর্যন্ত পৌছেনি, ফলে সেগুলি তার আমলকারীকে ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে ছোট শির্ক বলে।

১) রিয়া বা লোক দেখানো আমল- যেমন কোন মুসলমান আল্লাহ্র (সুব) জন্য কোন নেক কার্য করে এবং সালাত পড়ে। কিন্তু যদি সে সুন্দরও করে আমল করে ও সালাত পড়ে ঐ নিয়াতে যাতে মানুষ তার প্রশংসা করে তা হল রিয়া। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

> "যে আলস্নাহর সাথে সাড়্গাতের আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ ১১০)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"আমি সবচেয়ে যে জিনিসকে তোমাদের জন্য ভয় পাই তা হল ছোট শির্ক অর্থাৎ রিয়া। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ (সুব) যখন মানুষকে তাদের আমলের বদলা দিবেন তখন বলবেন- ঐ সমস্ত লোকদের নিকট যাও যাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমল করেছিলে; আর দেখ তাদের কাছে কোন বদলা পাও কিনা।"* (সহীহ আহমদ)

২) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া-

> নবী (সঃ) বলেনঃ *"যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন নামে প্রতিজ্ঞা করে সে যেন শির্ক করল।"* (সহীহ, আহমদ)

৩) গোপন শির্কঃ এটার ব্যাখ্যা দেন ইব্নে আব্বাস (রাঃ) এই বলে যে, যখন কোন ব্যক্তি কাউকে বলে- আল্লাহ্ (সুব) যা চান এবং তুমি যা চাও এবং এই জাতীয় কথা। যদি না আল্লাহ্ থাকত এবং অমুকে থাক। তবে এক্ষেত্রে এভাবে বলা যায় যে, 'যদি না আল্লাহ্ থাকত তারপর তুমি' - তা বলা জায়েয এবং নবী (সঃ) বলেনঃ *"তোমরা এভাবে বল না, যা আল্লাহ্ চান এবং অমুকে চায়। কিন্তু বলঃ যা আল্লাহ্ চান তারপর অমুকে চায়।"* (সহীহ, আহমদ)

শির্কের বাহ্যিক প্রকাশ

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিমরা আজ যে কষ্ট ও মুছিবতে জর্জরিত তার প্রধান কারণ হল, তাদের মধ্যে শির্ক প্রকাশ্যভাবে ও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যে আজ ফেৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, তা আল্লাহ্ পাকই তাদের উপর গযব হিসাবে নাযিল করেছেন- তার কারণ তারা তাওহীদ বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং তাদের আক্বীদা ও কাজের কর্মে শির্ক প্রকাশ পাচ্ছে। বেশির ভাগ মুসলিম দেশে এই অবস্থা বিরাজ করছে। শির্ককে উৎখাত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব এ কথা মুসলিম সমাজ জানলেও কোনটি শির্কী কাজ তা না জানার কারণে ঐ শির্কী কাজকেই সওয়াবের কাজ মনে করে আমল করে যাচ্ছে। তাই তারা এসব প্রচলিত শির্কের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে না।

শির্কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ

১) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়াঃ যা প্রকাশ পায় কবিতা ও গজলের মধ্যে, যা বলা হয় মিলাদুন্নবীতে অথবা কোন কোন বিশেষ ইসলামী অনুষ্ঠানে। লেখক বলেন, আমি একবার শুনেছিল কেউ বলছে, হে রাসূলদের ইমাম! হে আমার নেতা, আপনি আল্লাহ্র (সুব) দরজা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভরসা স্থল। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে নিজ হাতে ধরে নিন। আপনি ছাড়া আমার বিপদকে দূর করে সুদিন কেউ আনতে পারবে না। কেউ বলে, হে সমস্ত হযরতদের মাথার মুকুট। যদি আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) এ কথা শুনতেন তবে অবশ্যই নিজকে তার থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করতেন। কারণ, দুর্দিনকে সুদিন করতে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ পারে না। এই জাতীয় অনেক কবিতা ও গজল লেখা হয় সংবাদপত্রে, মাসিক পত্রিকাগুলোতে- এমনকি বইতে পর্যন্ত। আর তার মধ্যে আছে সাহায্য চাওয়া, বিপদমুক্তি, বিজয় কামনা ইত্যাদি আল্লাহ্ রাসূল হতে এবং আউলিয়া ও নেক্কার লোকদের নিকট হতে।

২) আউলিয়া ও নেককার লোকদের মসজিদে কবর দেয়াঃ দেখতে পাওয়া যায় বেশির ভাগ মসজিদেই কবর আছে। এবং তার উপর গম্বুজ, কুব্বাত তৈরী হয়েছে। এমনকি অনেকে তাদের কাছে চায় আল্লাহ্ ছেড়ে। এ ব্যাপারে নবী (সঃ) নিষেধ করে বলেনঃ

"আল্লাহ্র (সুব) অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

যদি নবীদেরকে মসজিদে দাফন করা কাফেরদের অভ্যাস হয়ে থাকে তবে কিভাবে জায়েয হতে পারে আউলিয়া ও পীরদের মসজিদে দাফন করা- এটা জেনে শুনে যে, এসব ব্যক্তিদের কাছে চাওয়া হবে আল্লাহ্কে ছেড়েঃ ফলে তা শির্কে পরিণত হবে।

৩) আউলিয়াদের নজর নেয়ায (মানৎ) দেয়াঃ কোন কোন ব্যক্তি গরু-বাছুর বা টাকা পয়সা কোন নির্দিষ্ট অলীকে নজর দেয়। এ নজর দেয়া শির্ক। তাই অতীব জরুরী এর থেকে বিরত হওয়া। কারণ, নজর দেয়া ইবাদত আর তা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে।

৪) নবী ও আউলিয়াদের কবরের কাছে যবেহ্ করাঃ যদিও নিয়ত এটা হয় যে, এই যবেহ করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) জন্য। কিন্তু মূলে এটা মুশরিকদের কার্য যারা তাদের ঐ সমস্ত আউলিয়াদের কবরের কাছ যবেহ্ করত, যাদেরকে তারা মূর্তি বানিয়ে পূজা করত।

৫) নবী ও আউলিয়াদের কবরে তাওয়াফ করা (ঘুরা)ঃ যেমন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ) অন্যরা। কারণ তওয়াফ হচ্ছে ইবাদত, যা কাবার চারপার্শ্বে ছাড়া অন্যত্র করা জায়েয নেই। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ

"তারা যেন বেশি বেশি আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করে।" (সূরা হজ্জ ২২ঃ ২৯)

৬) কবরের দিকে সালাত পড়া যা জায়েয নেই। নবী (সঃ) বলেনঃ

"তোমরা কখনো কররের উপর বস না এবং তার দিকে মুখ করে সালাতও পড় না।" (সহীহ মুসলিম)

৭) কোন কবরের দিকে বরকতের জন্য ভ্রমণ করা অথবা তার নিকটে গিয়ে সালাত পড়া জায়েয নেই। নবী (সঃ) বলেনঃ

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন দিকে ভ্রমণ কর না, মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদুল আক্‌সা।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

যখন আমরা মদীনায় যাওয়ার নিয়ত করি তখন যেন বলিঃ আমরা মসজিদে নব্বীতে যাচ্ছি যিয়ারতের জন্য এবং নবী (সঃ)-এর উপর সালাম দেয়ার জন্য।

৮) আল্লাহ্ (সুব) প্রেরিত আইন ছাড়া বিচার পরিচালনা করা, যেমন মানুষের বানানো আইন দ্বারা বিচার করা যা কুরআনের ও সহীহ হাদীসের বিপরীত। দেখা যায় যে, অনেক বুজুর্গ এ ধরনের ফতোয়া দিয়ে থাকেন যা কুরআন হাদীসের বিপরীত। যেমন সুদকে হালাল করা, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ (সুব) যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৯) নেতাদের বা আলেমদের বা বুজুর্গদের কথা মানা ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত। যেমন নবী (সঃ) বলেছেনঃ

"স্রষ্টার আনুগত্যের বিপরীতে সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না।" (সহীহ, আহমদ)

আলস্নাহ (সুব) বলেনঃ "তারা তাদের পাদরী এবং সংসারত্যগীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এবং মসীহ ইব্‌নে মরিয়মকেও কিন্তু তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র (সুব) ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তারা যে সমস্ত ব্যাপারে শির্ক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র।" (সূরা তওবা ৯ঃ ৩১)

হুযাইফা (রাঃ) তাদের ইবাদতের ব্যাখ্যা দেন যে, তাদের আলেমরা যা হালাল করত তারাও তাকে মেনে নিত এবং হারামের ব্যাপারেও তাই করত তা আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে হলেও।

মাজার ও দর্শনীয় বস্তু

মুসলমানদের দেশে আজ যে সমস্ত মাজার দেখছি যেমন সিরিয়া, ইরাক, মিসর, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশ এ হচ্ছে ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। কারণ নবী (সঃ) কবরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

"নবী (সঃ) কবরে রং, চুনকাম বা প্লাষ্টার করতে এবং তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম)

অন্য সহীহ হাদীস তিরমিযীতে আছেঃ তার উপর কোন কিছু লিখতে- তা কুরআনই হোক বা কবিতাই হোক।

১) এ সমস্ত মাজারগুলোর বেশির ভাগই ঠিক নয়। যেমন হোসেন (রাঃ) শহীদ হন ইরাকের কারবালাতে এবং তাঁকে মিসর নেয়া হয়নি, তাই মিসরে তার কবর মিথ্যা বানান। সবচেয়ে উত্তম প্রমাণ হল মুসলমানদেরকে মসজিদে দাফন করা হয় না। কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ্ (সুব) ইহুদীদের ধ্বংস করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরস্থানগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

এই হুকুমের মধ্যে হেকমত হল যাতে মসজিদগুলো শির্ক হতে সংক্ষিত থাকে। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"এবং নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহ্‌র জন্য, তাই সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে ডেক না।" (সূরা জ্বীন ৭২ঃ ১৮)

মূলতঃ নবী (সঃ)-কে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে দাফন করা হয়- মসজিদে দাফন করা হয়নি। যখন উমাইয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেছিল তখন তাঁর কবরকেও এর মধ্যে প্রবেশ করায়। হোসেন (রাঃ)-এর কবর এখন মসজিদের মধ্যে। কিছু কিছু লোকেরা তাঁর চারপার্শ্বে তওয়াফ করে এবং তার কাছে তাদের ঐ প্রয়োজনীয় জিনিস চায় যা শুধু একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাওয়া যায়, যেমন রোগমুক্তি ও বিপদমুক্তি। আমাদের দ্বীন আমাদের হুকুম করে তা আল্লাহ্ হতে চাইতে এবং কাবা ছাড়া অন্যের চারপার্শ্বে তওয়াফ না করতে।

২) ইসলাম নিষেধ করে করবের উপর গম্বুজ ইত্যাদি বানাতে। বরং মসজিদে তা বানাতে বলে। যেমন দেখা যায় হোসেন (রাঃ)-এর কবরে, আব্দুল কাদের জিলানীর কবরে এবং অন্যান্য স্থানে যে সম্বন্ধে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে। লেখক বলেনঃ আমার এক বন্ধু

বলেছেনঃ আমি এক ব্যক্তিকে দেখি সে আব্দুল কাদের জিলানীর কবরের দিকে সালাত পড়ছে কেবলাকে ত্যাগ করে। তাকে উপদেশ দিলে সে তা অস্বীকার করে এবং তাকে বলে যে, আপনি ওহাবী। হয়ত সে শুনেনি ঐ হাদীস - *"কবরের উপরে বস না এবং তার দিকে সালাতও পড় না।"* (সহীহ মুসলিম)

৩) বেশির ভাগ মাজার ও এই জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলো ফাতেমীদের সময় তৈরী হয়েছে। ইব্নে কাসীর (রহ) তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ কাফের, ফাসেক, পাপিষ্ঠ, ধর্মত্যাগী, জিনদিক, মুনাফিক, আল্লাহ্র (সুব) সিফাত অস্বীকারকারী এবং ইসলাম অস্বীকারকারী অগ্নি পূজকদের মত তারা ছিল কাফের। তাদের যামানায় তারা দেখে যে মুসল্লীরা মসজিদ পূর্ণ করে ফেলছে। তারা সালাতও পড়ত না এবং হজ্জও করত না। মুসলমানদের উপর হিংসা করত; ফলে তারা চিন্তা করল মানুষদেরকে মসজিদ হতে সরিয়ে দেয়ার। ফলে তারা মিথ্যা মাজার ও কুব্বা বানাতে শুরু করল। লোকদের ঐ ধারনা করাল ঐ সমস্তগুলোতে হোসেন (রাঃ) ও জয়নাব (রাঃ)-এর কবর। তাদের মধ্যে অনেক উৎসবের ব্যবস্থা করল যাতে মানুষ চোখ হতে নিজেদের ঢেকে রাখতে পারে। অন্য মুসলমানরা তাদের থেকে এই বেদ'য়াত নিয়েছে যা তাদেরকে শির্কের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলে এতে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করছে অথবা এ অবস্থায় মানুষের টাকা পয়সার দরকার অস্ত্রপাতি কেনার জন্য যাতে তাদের দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচাতে পারে।

৪) কিছু কিছু মুসলমানরা তাদের টাকা পয়সা ব্যয় করছে কবরের উপর ঘর বানাতে, মাজার বানাতে, দেয়াল তুলতে, কবরের উপর নানা নিদর্শন তৈরি করতে যা মৃতদের কোন উপকার দিতে পারে না। যদি এই টাকা পয়সা গরীবদের পিছনে ব্যয় করত, তবে জীবিতরা ও মৃতরাও উপকৃত হত। অথচ এসব করা হচ্ছে এ কথা জেনে শুনে যে, ইসলাম নিষেধ করেছে কবরের উপর ঘর বানাতে। নবী (সঃ) সাহাবাদের বলেছেনঃ *"কোন স্মৃতিসৌধ পেলে অবশ্যই তাকে ধ্বংস করবে, কোন উঁচু কবর পেলে তাকে ভেঙে দেবে এবং মাটির সমান করে দেবে।"* (সহীহ মুসলিম)

ইসলাম কবরকে মাত্র এক বিঘত উঁচু করতে অনুমতি দেয়।

৫) ঐ সমস্ত নেয়ায-নজর যা মৃতদের জন্য পেশ করা হয় তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যা তাদের খাদেমরা হারামভাবে উপার্জন করে। যা তারা পাপের কার্যে এবং ভোগ লালসার ক্ষেত্রে ব্যয় করে। ফলে যে নজর দেয় এবং নেয় উভয়ই এই পাপে শরীক হবে। যদি এই টাকাগুলো গরীবদের দান করা হত তবে তাদেরও উপকার হত এবং দানকারীও যে নিয়তে দান করেছে তার ফল পেত।

শির্কের ক্ষতিকর দিক এবং তার বিপদসমূহ

শির্কের অনেক অনিষ্টকর দিক আছে, ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে। তার বিশেষত্বগুলোঃ

১) শির্ক মানবতার জন্য অবমাননাকরঃ মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়। তার মর্যাদাকেও নিচু করে দেয়, কারণ আল্লাহ্ (সুব) মানুষকে খলীফা হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁকে সমস্ত নাম শিখিয়েছেন। তার অনুগত করে দিয়েছেন। যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে, তাকে এই জগতের সকলের উপর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সে তার অবস্থাকে ভুলে গেছে। ফলে সে এই জগতের কোন কোন জিনিসকেও ইলাহ ও মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। তার কাছে নিজেকে ছোট করে এবং অপমানিত হয়। এর থেকে অসম্মানের বিষয় আর কি হতে পারে যা আজকে দেখা যাচ্ছে কোটি কোটি লোক হিন্দুস্তানে গাভীর পূজা করছে যাকে আল্লাহ্ (সুব) মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জবেহ করে খাবার জন্য। আর দেখ কত মুসলমান মৃত মানুষের কবরের চতুষ্পার্শ্বে ঝাঁক ধরে বসে আছে। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করছে। অথবা তারাও তাদের মতই আল্লাহ্র (সুব) দাস। না নিজেদের জন্য তারা কোন উপকার করতে পারে; না ক্ষতি করতে পারে। দেখ, হোসেন (রাঃ) নিজেকে শহীদ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি জীবিতাবস্থায়। তবে কেমন করে অপরের কষ্ট দূর করবেন এখন মৃত্যুর পর এবং ভালকে ডেকে আনবেন? মৃতরাই জীবিত মানুষের দোয়ার মুখাপেক্ষী। তাই আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। আমরা যেন তাদের কাছে দোয়া না চাই আল্লাহ্কে ছেড়ে।

আল্লাহ্ (সুব) এই সম্বন্ধে বলেনঃ "যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে ডাকে এতটুকুও জিনিস সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃতরা কখনই জীবিতদের সমান নয় এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।" (সূরা নাহল ১৬ঃ ২০)

এবং অন্যত্র আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যে আল্লাহ্র (সুব) সাথে কোন শির্ক করে, যেন সে আকাশ থেকে পড়ে গেছে এবং এক পাখি তাকে ঠোঁট দিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে বাতাস বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে।" (সূরা হজ্জ ২২ঃ ৩১)

২) শির্কের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। কারণ যে মনে করে এই জগতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রভাব আছে, যেমন নক্ষত্র, জ্বিন, নশ্বর, আত্মা, ইত্যাদি তার বুদ্ধি এমন হয়ে যায় যে, সে সমস্ত কুসংস্কারকে গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের বিশ্বাস করতে শুরু করে। এভাবে সমাজের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করতে থাকে জ্বিন বশকারী, গণক, যাদুকর, জ্যোতীষ এবং এই জাতীয় লোকদের দ্বারা মিথ্যা দাবি করে যে, তারা ঐ ভবিষ্যৎ জানে যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ফলে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে আসবাব সংগ্রহের প্রচেষ্টা দুর্বল হয় এবং জগতের নিয়ম উল্টে যেতে থাকে।

৩) শির্ক সবচেয়ে বড় যুলুমঃ সত্যিই এটা যুলুম। কারণ সবচেয়ে বড় সত্য হল আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই ও অন্য কোন প্রতিপালক নেই। তিনি ছাড়া কেউ আইন প্রণেতা নেই। কিন্তু মুশরিক আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে মা'বুদ বানিয়ে নেয়। অন্যের কাছ থেকে আইন গ্রহণ করে এবং মুশরিক নিজের উপরও যুলুম করে। কারণ, মুশরিক তারই মত আরেকজন দাসের গোলাম হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ (সুব) তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। শির্ক অপরের উপর যুলুম। কারণ, যে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শির্ক করে সে তো অত্যাচার করল; এমন কাউকে সে হক্ক দিল যার ঐ অধিকার নেই।

৪) শির্ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূলঃ কারণ, যার মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমস্ত দিক হতেই সে ভয় পেতে শুরু করে। কারণ, সে নানা মাবুদের উপর ভরসা করতে শিখেছে। তাদের প্রত্যেকেই ভাল করতে অপারগ, এমনকি নিজেদের থেকেও তারা কষ্ট মুসিবত দূর করতে পারে না। ফলে যেখানে শির্ক চলতে থাকে সেখানে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভয় প্রকাশ পেতে থাকে কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই। আল্লাহ্ (সুব) এই সম্বন্ধে বলেনঃ

"যারা কুফরী করে আমি তাদের অন্তরে ভয়কে নিক্ষেপ করব। ঐ কারণে যে তারা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করছে, আর যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ (সুব) কোন প্রমাণ পাঠাননি। তাদের ঠিকানা আগুন এবং জালেমদের জন্য সেটা কতই না নিকৃষ্ট জায়গা।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ১৫১)

৫) শির্কের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কারণ সে তার অনুগামীদেরকে মাধ্যম ও শাফায়াতকারীর উপর ভরসা করতে শেখায়। ফলে নেক কাজগুলোকে সে ছাড়াতে শুরু করে এবং গুনাহ করতে শুরু করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত অলীরা তাদের জন্য আল্লাহ্র (সুব) কাছে সুপারিশ করবে। এটা ইসলামের পূর্বের আরবদের বিশ্বাস। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে এবং বলে, এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ), তোমরা কি আল্লাহ্কে আসমান ও জমিনের মধ্যে ঐ জিনিস শিখাতে চাও যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শির্ক করছে আল্লাহ্ (সুব) এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ১৮)

তাকিয়ে দেখ এই খৃষ্টানদের দিকে যারা একটার পর একটা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ঈসা (আঃ) যখন শূলে চড়েছেন তখন তাদের সমস্ত গুনাহ মুছে দিয়ে গেছেন। আজ দেখা যায় অনেক মুসলমান ফরজ, ওয়াজিব ত্যাগ করছে এবং নানা ধরনের হারাম কাজ করছে। তা সত্ত্বেও এ ধারণা করে বসে আছে যে, রাসূল তাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই শাফায়াত করবেন। কিন্তু রাসুল (সঃ) তাঁর আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেছেনঃ *"হে ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার যত সম্পদ দরকার তা আমার নিকট হতে চেয়ে নাও; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ্র (সুব) হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।"* (সহীহ বুখারী)

৬) শির্কের কারণে মানুষ চিরস্থায়ীভাবে আগুনে প্রবেশ করবে। শির্কের কারণে মানুষ দুনিয়াতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করবে। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (সুব) সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ্ (সুব) তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা আগুন এবং জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদা ৫ঃ ৭২)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"যে এভাবে মারা যায় যে সে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন শরীককে ডাকত, তবে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।"* (সহীহ বুখারী)

৭) শির্ক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়। আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা মুশরেকদের মত হয়ো না যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং তারা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে খুশী।" (সূরা রূম ৩০ঃ ৩১-৩২)

মূল কথা

অবশ্যই আগের এই সমস্ত অধ্যায়গুলো পরিষ্কারভাবে এটাই ফুটিয়ে তুলেছে যে, শির্ক খুব খারাপ কাজ, তাই এ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। তার থেকে দূরে সরে থাকা দরকার এবং তার মধ্যে ঢুকে পড়ার ব্যাপারে ভয় করা দরকার। কারণ, এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ। তা বান্দার সমস্ত আমলকেই নষ্ট করে দেয়, এমনকি তার ঐ সমস্ত নেক কাজও যাতে উম্মতের উপকার হত, মানবতার সেবা হত। যেমন আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "তাদের ঐ সমস্ত আমলকে আমার কাছে পৌঁছানো হবে কিন্তু সেগুলো আমি ধূলির মত উড়িয়ে দেব।" (সূরা ফুরকান ২৫ঃ ২৩)

শরীয়ত মত অসিলা তালাশ করা

আল্লাহ্ বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর কাছে অসিলা তালাশ কর।" (সূরা মায়িদা ৫ঃ ৩৫)

এর তাফসীরে কাতাদা (রহঃ) বলেনঃ তাঁর নিকটবর্তী হও তাঁর আনুগত্যের দ্বারা এবং ঐ সমস্ত আমলের দ্বারা যাতে তিনি খুশী হন। শরীয়ত মত অসিলা তালাশ করার ব্যাপারে কুরআনে আলস্নাহ্ আমাদেরকে হুকুম করেছেন এবং নবী (সঃ) তা বলেছেন এবং তার উপর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমল করেছেন। তার অনেক বিভাগ। বিশেষত্বগুলো হলোঃ

১) ঈমানের দ্বারা অসিলা বানানোঃ তাঁর বান্দারা কিভাবে ঈমানের সাহায্যে অসিলা তালাশ করবে- এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"হে আমাদের রব! আমরা শুনেছি এক ঘোষক ঈমানের দিকে এই বলে ডাকছে যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই শুনে আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে মাফ করে দিন সমস্ত গুনাহ খাতা হতে এবং আমাদেরকে দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত করে দিন ও যখন মৃত্যু আসে তখন নেককারদের দলভুক্ত করুন।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ১৯৩)

২) আল্লাহ্র একত্ববাদকে অসিলা বানানোঃ যেমন ইউনুছ (আঃ) দোয়া করেছিলেন যখন তাঁকে মাছে গিলে ফেলেছিল- আল্লাহ্ (সুব) কুরআনে বলেনঃ "তাই তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন, হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, সমস্ত পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ফলে আমি তার দোয়াকে কবুল করলাম এবং তাঁকে বিপদ হতে উদ্ধার করলাম। এভাবেই আমি মু'মিনদের বিপদ হতে উদ্ধার করি।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৮৭)

৩) আল্লাহ্‌র (সুব) পবিত্র নামের দ্বারা অসিলা খোঁজাঃ "আল্লাহ্‌র (সুব) সুন্দর সুন্দর নাম আছে এর দ্বারা তাঁর কাছে দোয়া কর।" (সূরা আরাফ ৭ঃ ১৮০)। এবং নবী (সঃ) তাঁর নামের দ্বারা সাহায্য চাইতেনঃ *"আমি তোমার কাছে তোমার সমস্ত নামের অসিলায় সাহায্য চাচ্ছি।"* (তিরমিযী, হাসান সহীহ)

৪) আল্লাহ্‌র (সুব) গুণের দ্বারা অসিলা তালাশ করা।

নবী (সঃ) বলেনঃ *"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার অসিলায় বিপদ হতে মুক্তি চাচ্ছি।"* (তিরমিযী, হাসান)

৫) নেক আমলের দ্বারা অসিলা খোঁজাঃ যেমন সালাত, পিতা-মাতার খেদমত, অন্যের হক আদায়ের দ্বারা, আমানত রক্ষার দ্বারা এবং অন্যান্য নেক আমল।

সহীহ মুসলিমে ঐ তিন বন্ধু যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের গল্প আছে। যখন তারা সেখানে আটকে পড়ে গেল তখন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের নেক আমলের দ্বারা অসিলা করল যার মধ্যে ছিল পিতা-মাতার খেদমত, শ্রমিকের হক ও আল্লাহ্‌র ভয়। এর ফলে আল্লাহ্ (সুব) তাদের হেফাজত করেন।

৬) কোন পাপকার্য ত্যাগের দ্বারা অসিলা তালাশ করাঃ যেমন যেনা, মদ এবং অন্যান্য হারাম কার্য যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ (সুব) নিষেধ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের একজন যেনা ত্যাগের অসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, যিনি তার চাচাতো বোনের সাথে যেনা করার সুযোগ পেয়েও আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে ত্যাগ করেন।

৭) নবী (সঃ)-এর উপরে দরূদ পড়াকে অসিলা বানানো, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা ও তাঁর প্রতি ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি আমাদের ভালবাসার অসিলা বানান। এগুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত নেককার্য যা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।

৮) যাকাত ও সদকা, নেক কথা, যিকির এবং কুরআন তেলাওয়াতের ও একত্ববাদীদের প্রতি ভালবাসা এবং মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করার দ্বারা অসিলা খোঁজা।

৯) নেককার জীবিত লোকদের কাছে দোয়া চাওয়া যেমন এবং অন্ধ সাহাবী রাসূল (সঃ)-এর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন যাতে আল্লাহ্ (সুব) তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। তাই তার জন্য নবী (সঃ) দোয়া করেন এবং তাকেও তাঁর সাথে দোয়া করতে বলেন। ফলে আল্লাহ্ (সুব) তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। কারণ নবী (সঃ)-এর দোয়া কবুল হবেই এবং সেটা তাঁর মোজেজা। কোন এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর শাফায়াত যাতে পান তার জন্য আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে দোয়া করেন এবং আল্লাহ্ (সুব) তা কবুল করেন।

যে যে অসিলা খোঁজা নিষেধ ও দ্বীনের মধ্যে যার মূল্য নেই- তার শ্রেণী বিভাগঃ

১) মৃতদের মাধ্যমে অসিলা খোঁজাঃ তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া যেটা আজ দেখা যাচ্ছে। একে মানুষ অসিলা মনে করে, কিন্তু মূলতঃ তা নয়। কারণ, অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্ নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দোয়া করা আল্লাহ্ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর। তা বড় শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "আল্লাহ্ ছাড়া এমন অন্যের কাছে দোয়া কর না যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে তোমার ক্ষতি করতে। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ১০৬)

২) নবী (সঃ) -এর সম্মানের অসিলা খোঁজাঃ যেমন বলা, হে আমার রব রাসূল (সঃ)-এর অসিলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা বেদ'আত। কারণ সাহাবীরা কেউ এটা করেন নাই। কারণ খলীফা ওমর (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসিলায় দোয়া করেছিলেন তার জীবিত অবস্থায় এবং রাসূল (সঃ)-এর মৃত্যুর তাঁর অসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করেননি। আর যে হাদীসে বলা হয় "আমাকে অসিলা করে দোয়া কর" সেটা মূলে হাদীসই নয়- যা শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন। আর এই বেদ'আতী অসিলা মানুষকে শির্‌কে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যখন এই ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ্ (সুব) কোন মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না। যেমন আমীর ও বিচারকগণ। এতে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের অসিলা করে আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়াকে, অপছন্দ করি।

৩) নবী (সঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে দোয়া করা। যেমন বলা, হে রাসূল (সঃ) দোয়া করুন। এটা জায়েয নয়। কারণ সাহাবীরা এটা কেউ করেননি। কারণ, আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলেছেনঃ *"যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমলনামা তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া বন্ধ হয়ে যায়ঃ সাদাকায়ে জারিয়া করে থাকলে এবং ঐ উপকারী ইল্‌ম যা সে শিখিয়েছে এবং নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।"* (সহীহ মুসলিম)

এই সমস্ত আমলগুলোর সওয়াব সে কবরেও পেতে থাকে।

আল্লাহ্ হতে সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী

যখন কোন পাঠক নবী (সঃ)-এর জীবনী পাঠ করবেন এবং তাঁর জিহাদ সম্বন্ধে পড়াশুনা করবেন তখন নীচের জিনিসগুলো জানতে পারবে–

১) তাওহীদের দাওয়াতঃ নবী (সঃ) মক্কায় ১৩ বছর পর্যন্ত মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন সমস্ত ইবাদতের মধ্যে এবং দোয়া ও হুকুমে, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং শির্‌কের বিরোধিতা করতে। এই আক্বিদা তাঁর সাহাবীদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, তাই তারা সাহসী হয়ে উঠেন; ফলে আল্লাহ্ ছাড়া তারা কাউকে ভয় করতেন না।

তাই দা'য়ীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাওহীদ দিয়ে দাওয়াত শুরু করা এবং শির্‌ক-এর ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা যাতে করে তাঁরা রাসূল (সঃ)-এর অনুগামী হতে পারে।

২) ভ্রাতৃত্বের সময়কালঃ রাসূল (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এজন্য যাতে মুসলমানদের মধ্যে এমন এক সমাজ গঠন করতে তুলতে পারেন যেটা ভালবাসার সূত্রের উপর গঠিত হবে। তাই সর্বপ্রথম শুরু করলেন মসজিদ বানানো দিয়ে যেখানে মুসলমানরা প্রত্যহ পাঁচবার একত্রিত হতে পারেন তাঁদের রবের ইবাদতের জন্য। যাতে করে তাঁদের জীবন সুগঠন হতে পারে এবং প্রথম হতেই নবী (সঃ) করেছিলেন মদীনার অধিবাসী আনসারদের সাথে এবং মক্কার ঐ মুহাজিরদের সাথে ভ্রাতৃত্ব গঠন করতে যাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তাই আনসাররা তাদের ধনসম্পদ মুহাজির ভাইদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। আর তাঁদের যত কিছু প্রয়োজন ছিল তা পূরণ করতেন। নবী (সঃ) যখন মদীনাতে হিজরত করেন তখন দেখেন যে, তারা আউস ও খাজরাজ দুই গোত্রে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে ছিল পুরাতন শত্রুতা। তিনি তাঁদের মধ্যকার শত্রুতা মিটমাট করে দিলেন এবং তাঁদেরকে এমন এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন যাতে করে তাঁরা ঈমান ও তৌহিদের ক্ষেত্রে একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করল।

৩) নিজেদের তৈরি হওয়ার যামানাঃ কুরআনে আল্লাহ্ তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য পার শক্তি সঞ্চয় করতে থাক।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৬০)

এই আয়াত সম্পর্কে নবী (সঃ) ব্যাখ্যা দেন- *"ওহে নিশ্চয়ই নিক্ষেপই হচ্ছে শক্তি আছে।"* (সহীহ মুসলিম)

তীর নিক্ষেপ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তা শিক্ষা করা সমস্ত মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এরই মধ্যে শামিল কামান, ট্যাঙ্ক এবং উড়োজাহাজ চালানো শিক্ষা এবং অন্যান্য ঐ সমস্ত অস্ত্রপাতির ব্যবহার যার মধ্যে নিক্ষেপ করা শিখতে হয়। আজ যদি স্কুল, কলেজের ছাত্ররা নিক্ষেপ করা শিখত! আর তা শিখতে প্রতিযোগিতা করত তবে এই প্রতিযোগিতাই তাদের ঐ উপকার দিত যাতে তারা দ্বীনের ব্যাপারে এবং তাদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য হেফাজতের ব্যবস্থা নিত। কিন্তু আজ মুসলিমদের ছেলেরা তাদের সময়কে নষ্ট করছে ফুটবল খেলার পিছনে এবং ফুটবলের প্রতিযোগিতায় এবং উরন্নকে বের করে তারা খেলছে। কিন্তু ইসলাম আমাদের হুকুম দিয়েছে তাকে ঢেকে রাখার জন্য এবং সাথে সাথে সালাতকেও নষ্ট করে ফেলছে যার হেফাজত সম্বন্ধে ইসলাম আমাদের হুকুম দিয়েছে।

৪) আমরা যখন একই আক্বিদার উপর প্রত্যাবর্তন করব এবং আমল করতে থাকব তখন আমরা একে অপরের ভাই হয়ে যাবো। সেই সাথে যদি আমরা দ্বীনের জন্য আমাদের শত্রুদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে মওজুদ সব ধরনের অবলম্বন এবং অস্ত্রপাতিসহ তৈরি হই, তবে ইনশাআল্লাহ তখনই আল্লাহ্র তরফ থেকে মুসলিমদের সাহায্য আসবে, যেমনভাবে নবী (সঃ) এবং তার সাথী কেরামদের উপর আল্লাহ্র (সুব) সাহায্য এসেছিল। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দান করবেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ ৭)

৫) এই সমস্ত কথার অর্থ এই নয় যে, এ অবস্থা আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বের সময়কাল তাওহীদের সাথে সাথে আসবে না। বরঞ্চ এ অবস্থাগুলো একে অপরের সহিত সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "এবং আমার উপর দায়িত্ব হয়ে যাবে মু'মিনদেরকে সাহায্য করা।" (সূরা রূম ৩০ঃ ৪৭)

উপরোক্ত আয়াতসহ বহু আয়াতে আল্লাহ্ (সুব) মু'মিনদের সাহায্য করার ব্যাপারে পরিষ্কার অঙ্গীকার করেছেন। আর তা এমন এক সত্তার ওয়াদা যার পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ্ (সুব) রাসূলকে (সঃ) বদরের মাঠে, খন্দকের মাঠে এবং অন্যান্য জিহাদে জয়যুক্ত করেছেন। তাঁর ওফাতের তাঁর সাহাবীদেরকেও আল্লাহ্ (সুব) তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছেন। এভাবেই মুসলিমগণ আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে একের পর এক দেশ জয় করেছিলেন এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল,যদিও নানা ধরনের বিপদ-আপদ, বালা মুসিবতমুসলিমদেরকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত মু'মিন মুসলিমগণ তাঁদের সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় ঈমান, তাওহীদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁদের রবের প্রতি দৃঢ় ছিলেন বলেই আল্লাহ্র মদদ পেয়েছিলেন। পরিণামে তারাই হয়েছিলেন জয়যুক্ত দল।

কুরআনুল করীমে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই, বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা সংখ্যায় ও সমরাস্ত্র উপকরণে ছিলেন খুবই নগণ্য। তাঁরা তাদের রবকে ডেকে বলেনঃ "যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করে বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাহায্য করব হাজার হাজার ফিরিশ্তা (মালাইকা) দিয়ে।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৯)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দোয়া কবুল করেন। ফিরিশ্তারা (মালাইকারা) তাঁদের সাথে একত্রে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে সাহায্য করেছিলেন। কাফিরদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করেছিলেন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ "তাদের ঘাড়ে গর্দানে আঘাত কর, তাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গে আঘাত কর।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ১২)

এভাবেই একত্ববাদী মু'মিনরা আল্লাহ্ হতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "এবং অতি অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের বদরের মাঠে সাহায্য করেছিলেন, যদিও তোমরা ছিলে খুবই দুর্বল। তাই আল্লাহ্কে উত্তমভাবে ভয় কর, যাতে তোমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পার।" (সূরা আলি-'ইমরান ৩ঃ ১২৩)

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বদরের মাঠে এই বলে দোয়া করেছিলেনঃ *"হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ জিনিস দান করুন যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন। হে আল্লাহ্! মুসলিমদের এই ছোট দলকে যদি ধ্বংস করেন তবে পৃথিবীর বুকে আপনার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।"* (সহীহ মুসলিম)

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কিন্তু কোথাও জয়যুক্ত হচ্ছে না। তার কারণ কি? আল্লাহ্ (সুব) কি মুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করছেন? না, কখনই না। তাহলে কারা ঐ মু'মিনরা, যাদের সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ্র (সুব) কুরআনে ওয়াদা করা হয়েছে। আমরা মুজাহিদ ভাইদেরকে বলছি, তারা নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুনঃ

১) যে মূলমন্ত্র দ্বারা রাসূল (সঃ) জীবনে, জিহাদের পূর্বেই, সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তারা কি সেই ঈমান ও তাওহীদের শক্তিতে নিজেদেরকে ভূষিত করেছে?

২) তারা কি ঐ সমস্ত সমরোপকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাদের ব্যাপারে তাদের রব তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য পার শক্তি সঞ্চয় করতে থাক।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৬০)

নবী (সঃ) এই শক্তি বলতে বুঝিয়েছেন, নিক্ষেপ করা (তীর, ইত্যাদি)।

৩) তারা কি তাদের রবকে সর্বদা সর্বাবস্থায় ডাকে এবং যুদ্ধের সময় এককভাবে একমাত্র তাঁর নিকটেই দোয়া করে, নাকি এই দোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যদেরও শরীক করে? তারা যাদের অলী বলে তারা তো আসলে আল্লাহ্র (সুব)ই বান্দা বা দাস। তারা তাদের নিজেদেরও ভাল কিংবা মন্দ কিছুই করতে পারে না। কেন তারা দোয়ার ক্ষেত্রে রাসূলকে (সঃ) অনুসরণ করে না, যিনি সর্ববস্থায় একমাত্র তাঁর রবের নিকটই দোয়া করতেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্ই কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ ৩৬)

৪) সর্বশেষে তারা প্রশ্ন করুক, তারা কি একতাবদ্ধ এবং একে অপরকে সর্বাবস্থায় ভালবাসে? আসলে তাদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে, আল্লাহ্র (সুব) ঐ কথাঃ "এবং তোমরা একে অপরের সাথে বিবাদ কর না, যদি কর তাহলে সাহস হারাবে ও তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৪৬)

যদি মুজাহিদগণ ঈমানের ঐ পর্যায়ে উঠতে পারে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ্র (সুব) ওয়াদাকৃত সাহায্য আসবে। কারণ, আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"মু'মিনদের সাহায্য করাতো আমার জন্য জরুরী।" (সূরা রূম ৩০ঃ ৪৭)

বড় কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ

বড় কুফর কুফরকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর তা হল বিশ্বাসের মধ্যে কুফরী। তার বহু শ্রেণী; তার মধ্যেঃ

১) মিথ্যার কুফরঃ কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করা; অথবা তাদের কোন অংশকে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"ওর থেকে কে বড় জালেম হতে পারে যে আল্লাহ্র (সুব) উপর মিথ্যা কথা বলে অথবা সত্য তার কাছে সমাগত হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। জাহান্নাম কি কাফেরদের থাকার জন্য যথেষ্ট নয়?" (সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৬৮)

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর?" (সূরা আল-বাক্বারা ২ঃ ৮৫)

২) অস্বীকার ও অহঙ্কারের কুফরীঃ তা হল সত্যকে জেনেও তার অনুসরণ না করা যেমন ইবলিস করেছিল। তার প্রমাণ আল্লাহ্ বলেনঃ

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা করার জন্য তখন সকলে সেজদা করল ইবলিশ ছাড়া। ইবলিশ অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা বাকারা ২ঃ ৩৪)

৩) কিয়ামতের দিনের সম্বন্ধে সন্দেহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে না মানা। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"আমার মনে হয় না কেয়ামত ঘটবে এবং যদিও আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ফেরত যাই অবশ্যই এর থেকে ভাল জিনিস সেখানে পাব। তাকে তার ঐ সাথী বলল যিনি তার সাথে কথা বলছিলেনঃ কিভাবে তুমি তাকে অস্বীকার কর যিনি তোমাকে মাটি হতে, সৃষ্টি করেছেন, তারপর মনি হতে, তার পর পূর্ণ মানুষ বানিয়েছেন।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ ৩৬-৩৭)

৪) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীঃ ইসলাম যা দাবি করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাসও না করা। তার প্রমাণ- আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যারা অস্বীকার করে ঐ সমস্ত জিনিসকে যে সম্বন্ধে তাদের ভয় দেখান হয় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্কাফ ৪৬ঃ ৩)

৫) নিফাকীর কুফরীঃ তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর কুফরী করেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তারা আর বুঝতে পারে না।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩ঃ ৩)

অন্যত্র বলেনঃ "মানুষদের ভিতরে অনেকে আছে যারা মুখে বলে- আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আনেনি।" (সূরা আল বাকারা ২ঃ ৮)

৬) অস্বীকারে কুফরীঃ তা হল দ্বীনের প্রকাশ্য কোন জিনিসকে অস্বীকার করা। যেমন ইসলাম বা ঈমানের ভিত্তিগুলো এবং ঐ লোক সালাতকে অস্বীকার করে এবং ত্যাগ করে। সে তো কাফের বা ধর্মত্যাগী। এ রকমভাবে কোন বিচারক যখন আল্লাহ্র (সুব) আইনকে অস্বীকার করে কিংবা সেই অনুযায়ী বিচার না করে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"যা আল্লাহ্ (সুব) অবতীর্ণ করেছেন সে মতে যারা বিচার করে না তারাই কাফের।" (সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ৪৪)

ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করল সে যেন কুফরী করল।

ছোট কুফর এবং তার শ্রেণী বিভাগ

এই ছোট কুফর কুফরকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমনঃ

১) নিয়ামতের সাথে কুফরী করাঃ প্রমাণ- আল্লাহ্ (সুব) মূসা (আঃ)-এর কওমের মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

"যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন যদি তোমরা শুকরিয়া জানাও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের সর্বাধিক বাড়িয়ে দেব এবং যদি তা অস্বীকার কর তবে নিশ্চয়ই আমার আযাব খুবই নির্মম।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ৭০)

২) আমলের ক্ষেত্রে কুফরীঃ এটা ঐ সমস্ত পাপের কাজ যাকে শরীয়তের কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদিও তার আমলকারীকে ঈমানদার বলেই বলা হয়েছে। যেমন নবী (সঃ) বলেনঃ *"মুসলমানকে গাল দেয়া ফাসেকী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।"* (সহীহ বুখারী)

অন্যত্র বলেনঃ *"যখন যেনাকারী যেনা করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না এবং যখন মদ্যপ মদ পান করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না।"* (সহীহ মুসলিম)

অন্যত্র নবী (সঃ) বলেনঃ *"বান্দা এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাতকে ছেড়ে দেয়া।"* (সহীহ মুসলিম)

যদিও সালাত ত্যাগ করেন, অলসতা করে, অস্বীকার না করেও তাকে কুফরী বলেছেন কিছু সংখ্যক আলেম। সালাতকে ত্যাগ করা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

তাগুতদের থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও

তাগুত ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে বলা হয় যাদের ইবাদত করা হয় আলস্নাহ্কে ছেড়ে এবং সে তাতে রাজী খুশি থাকে। তাকে ঐ সমস্ত কাজে অনুসরণ করা হয় যা আলস্নাহ্ ও নবীর (সঃ) আনুগত্যের বাইরে। আলস্নাহ্ (সুব) রাসূলদের পাঠিয়েছেন এই বলে যে, তারা যেন তাদের লোকদের বলে এক আলস্নাহ্র ইবাদত করতে এবং তাগুতদের থেকে বিরত থাকতে। আলস্নাহ্ (সুব) বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক কাওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, আলস্নাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতদের থেকে দূরে থাক।" (সূরা নাহল ১৬ঃ ৩৬)

১) ঐ শয়তান যে মানুষকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে। প্রমাণঃ

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়াতানের ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ৬০)

২) আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক। যেমন ঐ সমস্ত আইন বানান যা ইসলামের বিরম্নদ্ধে যায়। তার প্রমাণঃ আলস্নাহ (সুব) বলেন ঐ কুফরী আইন প্রণয়নকারীদের ধিক্কার দিয়েঃ

"তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে ঐ বিধান প্রবর্তন করে যার অনুমতি আলস্নাহ্ দেননি।" (সূরা শূরা ৪২ঃ ২১)

৩) ঐ বিচারক যে আলস্নাহ্র আইনে বিচার করে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

"যারা আল্লাহ্ হতে অবতীর্ণ আইনে বিচার করে না তারাই হচ্ছে কাফের।" (সূরা মায়িদা ৫ঃ ৪৪)

৪) যে এই মিথ্যা দাবী করে যে, সে ভবিষ্যৎ জানে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"বল (হে মুহাম্মদ) দুনিয়া ও আসমানের কেউ গায়েব জানে না আল্লাহ্ ছাড়া।" (সূরা নামল ২৭ঃ ৬৫)

৫) যাকে মানুষরা ইবাদত করে এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে তার কাছে দোয়া করে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। প্রমাণঃ

"তাদের মধ্যে যে বলে আল্লাহ্ ব্যতীত আমিও মা'বুদ, তাকে তার বদলা দিব জাহান্নাম। এভাবেই আমি অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ২৯)

জেনে রেখ, প্রত্যেক মু'মিনের উপর জরুরী হল তাগুতদের অস্বীকার করা যাতে সম্পূর্ণভাবে ঈমানদার হতে পারে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যে তাগুতদের অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র (সুব) উপর ঈমান আনে সে যেন এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবার নয় এবং আল্লাহ্ (সুব) সমস্ত কিছু শোনেন ও জানেন।" (সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৫৬)

এই আয়াতটি এই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র (সুব) ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করা হতে বিরত না হবে। এই সম্বন্ধে নবী (সঃ) বলেনঃ *"যে বলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যদের যে ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করে তার মাল ও রক্ত অন্যের উপর হারাম।"* (সহীহ মুসলিম)

বড় নিফাক ও মোনাফেকী

তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী ধারণা পোষণ করা। তার কয়েকটি শ্রেণী-

১) রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা বলে মানা।

২) নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার কোনটাকে মিথ্যা বলা।

৩) নবী (সঃ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

৪) নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা কোন কোনটার সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

৫) ইসলামে ক্ষতি হলে খুশী হওয়া।

৬) ইসলামের বিজয়কে অপছন্দ করা।

মুনাফিকদের শাস্তি কাফেরদের শাস্তি হতেও প্রচন্ড এবং তা আরও মারাত্মক। আল্লাহ্ বলেনঃ "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের ঠিকানা আগুনের সর্বনিম্ন স্থান।" (সূরা নিসা ৪ঃ ১৪৫)

এই কারণে আল্লাহ্ (সুব) সূরা বাকারার প্রথম দিকে দু'টি আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ১৩টি আয়াতের মধ্যে। আমরা দেখতে পাই সুফীরা মুসলমান, সালাত পড়ে, রোযাও রাখে, কিন্তু তারা মুসলমানদের আক্বীদা নষ্ট করে দেয়, যখন আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের কাছে দোয়া করাকে জায়েয বলে- যা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তারা এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ (সুব) সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্ (সুব) যে আরশের উপর আছেন তাও তারা অস্বীকার করে। কুরআনের কোন কোন আয়াত ও সহীহ হাদীসকে পর্যন্ত অস্বীকার করে।

ছোট নেফাক বা ছোট মুনাফিকী

তা হচ্ছে আমলের মধ্যে মুনাফিকী যেমনঃ ঐ মুসলিম যে মুনাফিকদের ঐ সমস্ত দোষে দোষী যার সম্বন্ধে নবী (সঃ) বলেনঃ

"মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটাঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট আমানত দেয়া হয় তা নষ্ট করে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সঃ) অন্যত্র বলেনঃ *"যাদের মধ্যে এই চারটি দোষ আছে তারা পূর্ণ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটাও আছে, তার মধ্যে এই মুনাফিকী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ত্যাগ করে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যদি প্রতিজ্ঞা করে ভঙ্গ করে, যদি চুক্তি করে তা ভাঙ্গে, যদি শত্রুতা করে সীমা অতিক্রম করে ।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীস)

এই নেফাক নেফাকীকে ইসলাম থেকে বের করে না, কিন্তু তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আলেমদের কাছে এর অর্থ আমলের ক্ষেত্রে নেফাক। এটাই ছিল নবী (সঃ)-এর যামানায় মিথ্যার নেফাক।

আল্লাহ্র (সুব) আউলিয়া ও শয়তানের আউলিয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "ওহে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র (সুব) আউলিয়া, তাদের কোন ভয় নেই, আর না তারা হবে পেরেশান। (তারা হচ্ছে ওরা) যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্কে সর্বদা ভয় করে।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ৬২)

উপরে উল্লেখিত আয়াত আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্র (সুব) অলী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন মুত্তাকী এবং পাপ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন। তিনি সর্বদা তাঁর রবকে এককভাবে ডাকেন এবং তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করেন না। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বারা কারামত প্রকাশ করেন, যেমন মরিয়ম (আঃ)-এর ঘরে সর্বদা রিযিক আসত গায়েব হতে।

তাই অলীত্ব সত্য। কিন্তু অলী হবেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন, আল্লাহ্র অনুগত এবং একত্ববাদী। এটা সত্য নয় যে, অলী হওয়ার জন্য তার দ্বারা কারামত প্রকাশ পাবে। কারণ পবিত্র কুরআন এ ধরনের কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেনি। এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে, কোন ফাসেক কিংবা মুশরিক ব্যক্তির মধ্যে অলীত্ব প্রকাশ পাবে। কারণ যে ব্যক্তি মুশরিকদের মত আলস্নাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট দোয়া করে, সে কেমন করে আল্লাহ্র (সুব) সম্মানী অলী হতে পারে? আর কারামত বাপদাদার নিকট থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া কোন বস্তু নয়। বরং তার সাথে জড়িত ঈমান ও নেক আমল। অনেক সময় দেখা যায় যে, বেদ'আতীরা তাদের শরীরের মধ্যে লোহা ইত্যাদি প্রবেশ করাচ্ছে অথবা আগুন গিলে খাচ্ছে। আসলে তা হচ্ছে শয়তানের কাজ। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এ ধরনের উদ্ভট কার্যকলাপ প্রদর্শন করে কারামত বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এ সমস্ত কাজ দ্বারা বরং তারা ক্রমান্বয়ে গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী) বলুন, যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে আছে আল্লাহ্ তার গোমরাহীর রাস্তাকে আরও প্রশস্ত করে দেন।" (সূরা মারিয়াম ১৯ঃ ৭৫)

যারা হিন্দুস্থান গিয়েছেন তারা অগ্নি উপাসকদের নিকট এর চেয়ে ভয়ানক জিনিস দেখতে পেয়েছেন। যেমন তারা তলোয়ার দিয়ে একে অপরকে আঘাত করে, তবুও তাদের কোন ক্ষতি হয় না, যদিও তারা কাফের, মুশরিক। ইসলাম এ জাতীয় কার্যাবলী, যা রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা করেন নাই, তার কোন স্বীকৃতি দেয় না। যদি এই জাতীয় কার্যাবলীর মধ্যে কোন ফায়দা থাকত তবে অবশ্যই তারা এতে অগ্রগামী থাকতেন।

অনেকেরই ধারণা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র অলীরা গায়েবের খবর জানেন। কিন্তু সত্যিকারের গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ্র (সুব) হাতে। তবে কখনও কখনও গায়েবের কোন কোন খবর তাঁর কোন রাসূলদের জানিয়েছেন। আলস্নাহ্ (সুব) বলেনঃ "তিনি (আলস্নাহ) হচ্ছেন

গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাঁকে ব্যতিত।" (সূরা জ্বীন ৭২ঃ ২৬-২৭)

এই আয়াতে শুধু রাসূলদের কথা বলা হয়েছে। অন্য কারো কথা বলা হয়নি।

কোন কোন লোকদের ধারণা, কবরের উপর গম্বুজ ইত্যাদি বানানো হলেই তা কোন অলীর কবর। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তা হয়তো কোন ফাসেকের কবর, অথবা আদৌ ওখানে কাউকে কবর দেয়া হয়নি। কবরের উপর কোন গম্বুজ, স্মৃতিসৌধ, ইত্যাদি নির্মাণ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। হাদীসে আছেঃ *"রাসূল (সঃ) কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা বা চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন।"* (সহীহ মুসলিম)

যাকে মসজিদে দাফন করা হয়, সে কখনই অলী হতে পারে না। আর কারও জন্য মাজার বানানো হলে কিংবা কবরের উপর গম্বুজ বানানো হলে তা অলীদের কাজ হতে পারে না। কারণ, এগুলো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। মৃত ব্যক্তিদের স্বপ্নে দেখতে পাওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে অলী হওয়ার মাপকাঠি নয়, বরং তা অনেক সময় শয়তানের ধোঁকাও হতে পারে।

ঈমানের শাখাসমূহ

নবী (সঃ) বলেনঃ *"ঈমানের ৬৩ হতে ৬৯ শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।"* (সহীহ মুসলিম)

ইব্নে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীতে বলেনঃ ইব্নে হিব্বান যা বলেছেন তার সারমর্ম হল- এই বিভাগগুলোর শ্রেণীবিভাগ মানুষের অন্তরের কাজ, জিহবার কাজ এবং শারীরিক কাজ।

১) অন্তরের কাজ হল বিশ্বাস ও নিয়তঃ এর ২৪টি ভাগ। আল্লাহ্র উপর ঈমান, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর জাতের উপর এবং সিফাতির উপর এবং তৌহিদের উপর ঈমান। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ "তার মত কেউ নেই। তিনি শোনেন ও দেখেন।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ১১)

তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে এবং ইবাদত অন্যের জন্য না করা। যেমন দোয়া, সাহায্য অথবা এ জাতীয় অন্যান্য কার্য, ফেরেশতাদের উপর ঈমান, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূলদের উপর, তাঁ ক্বদরের উপর, ভাল ও মন্দের উপর ও আখেরাতের উপর ঈমান আনা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল কবরের সওয়াল এবং পুনরুত্থান এবং কবর থেকে উঠান, হিসাব নিকাশ, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ্র সাথে মহব্বত, ভালবাসা এবং শত্রুতা তাঁর কারণেই। নবী (সঃ)-এর সাথে মহব্বত এবং তাঁকে সম্মান করা। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর উপর দরূদ পড়া এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং ইখলাস। অন্তরেরর কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরও হল রিয়া ও নেফাককে ত্যাগ করা। তওবা করা, ভয় করা, আশা করা, শুকরিয়া আদায় করা, সততা, সবর, আল্লাহ্র বিচারে রাজী থাকা এবং তাওয়াক্কুল রহমত বিনয়-নম্রতা। এর মধ্যে প্রবেশ করে বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি ভালবাসা এবং অহংকার ও আত্মগর্ব ত্যাগ করা, হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করা এবং রাগ ত্যাগ করা।

২) জিহবার আমলঃ এর মধ্যে সাতটা ভাগ অন্তর্ভুক্ত। কালেমা শাহাদত পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, দ্বীনি শিড়্গা অর্জন করা এবং অন্যকে শেখানো। দোয়া, যিকির, তার মধ্যে আছে এস্তেগফার করা এবং খারাপ কথা থেকে বিরত থাকা।

৩) শরীরের আমলঃ এর মধ্যে ৩৮টি ভাগ আছে।

(ক) এর মধ্যে কতকগুলো চোখের সাথে জড়িত সেগুলো ১৫টি। এর মধ্যে আছে পবিত্রতা। এর মধ্যে আছে অন্যকে খাবার খাওয়ানো এবং মেহমানদের সম্মান, রোযা রাখা ও নফল ও ফরয। ইতেকাফ করা, লাইলাতুল কাদর খোজা, হজ্জ ও ওমরা করা, তাওয়াফও সেই রকম। দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্য অন্যত্র হিজরত করা, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শির্কের দেশ থেকে হিজরত করা। নজরকে পূর্ণ করা, কসম পূর্ণ করা, এর মধ্যে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়া প্রয়োজন। কাফ্ফারা আদায় করা- যেমন প্রতিজ্ঞা পালনের, রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাসের ইত্যাদি।

(খ) এর মধ্যে যা অনুসরণের সাথে জড়িত। সেগুলো হল ছয়টি। বিবাহের দ্বারা নিজের ইজ্জত রক্ষা করা এবং পরিবারের হক আদায় করা, বাপ মায়ের খেদমত করা। এর মধ্যে তাদের কষ্ট না দেয়া এবং বাচ্চাদের ইসলাম মতনুযায়ী পরিচালন করা। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, নেতাদের মান্য করা-পাপের কাজ ছাড়া অন্যত্র, দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করা।

(গ) অন্য কতকগুলো যা সাধারণভাবে সকলের সাথে জড়িতঃ এর মধ্যে ১৭টি ভাগ আছেন। ন্যায় বিচারের সাথে আমীরের দায়িত্ব পালন করা, মুসলমানদের জামাহ্র সাথে থাকা,আমিরদের কথা মান্য করা, যদি না কোন পাপের হুকুম দেয়। মানুষের মধ্যে মিলমিশ ঘটান, তার মধ্যে খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা, নেক কার্যে ও তাকওয়ার কার্যে সহযোগিতা করা। এর মধ্যে নেকের প্রতি আদেশ ও অন্যায় হতে বিরত হওয়া অন্তর্ভুক্ত। হজ্জ কায়েম করা, জিহাদ করা, তার মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়া এবং আমানত আদায় করা, তার মধ্যে গনিমতের ১/৫ বাইতুল মালে দেয়া। ফরজ আদায় করা, প্রতিবেশীকে সম্মান করা, ব্যবসা বাণিজ্য ভালভাবে করা, তার মধ্যে হালাল উপায়ে মাল কামাই করা এবং হক দেখে দেখে খরচ করা, তার মধ্যে আসে বাহুল্য খরচ না করা, সালামের উত্তর দেয়া ও হাঁচির জবাব দেয়া, মানুষদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, খেল তামাশা হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করা।

এ হাদীস এটাই দেখাচ্ছে যে, তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম স্তর। তাই দা'য়িদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে সে সর্বোচ্চ দিয়ে শুরু করে তারপর নিচের দিকে নামবে। প্রথমে ভিত্তি তারপর দেয়াল তারপর যেটা যত দরকারী। কারণ, তাওহীদই আরব ও আজমকে এক করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছে তাওহীদের রাষ্ট্র।

কিভাবে বিপদ দূরীভূত হয়

১) কুরআন বর্ণনা করছে কিভাবে মুসিবত অবতীর্ণ হয় ও কিভাবে আল্লাহ্ (সুব) তা বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেনঃ

"তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ (সুব) কখনোই তার দেয়া নেয়ামতকে যা তিনি কোন জাতিকে দিয়েছেন পাল্টান না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা তা পরিবর্তন করেন।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৫৩)

২) অন্যত্র বলেনঃ "তোমাদেরকে যে সমস্ত বিপদ স্পর্শ করে তা তোমাদের নিজেদের হাতে উপার্জন এবং তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করেন।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ৩০)

৩) অন্যত্র বলেনঃ "জলে ও স্থলে যে ফিৎনা ফাসাদ প্রকাশ পাচ্ছে তার কারণ হল মানুষ যা অর্জন করেছে তাদের হাতের আমলের দ্বারা, যাতে তারা যা করেছে তার কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে পারে, সম্ভবতঃ তারা প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা রূম ৩০ঃ ৪১)

৪) অন্যত্র বলেনঃ "আল্লাহ্ (সুব) এক জনপদের উদাহরণ দিচ্ছেন যা ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে। তার রিযিকসমূহ চতুর্দিক হতে প্রচুর পরিমাণে আসত। কিন্তু তারা আল্লাহ্র নেয়ামতের কুফরী করল। ফলে আল্লাহ্ (সুব) তাদেরকে ক্ষুধার ও ভয়ের পোশাক পরিধান করালেন তারা যা করত তার শাস্তি স্বরূপ।" (সূরা নাহল ১৬ঃ ১১২)

আল-কুরআন মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করছে- যখন তাদের উপর বিপদ মুসীবত অবতীর্ণ হত তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকত। তারপর আবার শির্কের মধ্যে ফেরত আসত। ভাল সময়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকত। আল্লাহ্ (সুব) তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ "যখন তারা নৌকাতে চড়ত তখন ইখলাসের সাথে আল্লাহ্কে ডাকত। তারপর যখন তাদেরকে তিনি বাঁচিয়ে তীরে তুলতেন তখনই তারা আবার শির্ক শুরু করত।" (সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৬৫)

৫) এই আয়াতসমূহ আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ (সুব) সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। তিনি কখনোই কোন জনপদের বালা মুসিবত অবতীর্ণ করেন না, যতক্ষন না আল্লাহ্র সাথে তারা পাপ না করে তাঁর হুকুম আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করলে, আর বিশেষ করে যখন তাওহীদ হতে দূরে চলে যায়। আজ বেশির ভাগ মুসলমানদের দেশে শির্কের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে যার কারণে একটার পর একটা ফেতনা ও পরীক্ষা আসছে আল্লাহ্ হতে। এটা কখনই বন্ধ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এক আল্লাহ্র দিকে ফেরত আসে এবং শরীয়ত কায়েম করে- ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে।

৬) দেখা যায়, আজকাল বহু মুসলমান যখন বিপদে পড়ে তখনই গাইরুল্লাহকে ডাকতে থাকে। বলতে থাকে (হে খাজা বাবা, হে বড়পীর সাব)। তারা শির্ক করছে সুসময়ে ও দুঃসময়ে তাদের প্রতিপালকের কথার বিরোধিতা করে এবং রাসূল (সঃ)-এর কথারও বিরোধিতা করে। (নাউজুবিল্লাহ)

৭) মুসলমানরা যখন ওহুদের যুদ্ধে পরাজিত হয় তাদের কিছু সংখ্যক তীরন্দাজরা তাদের নেতার কথা না মানার কারণে তখন তারা খুব অবাক হয়ে যান। তাদের সম্বন্ধে কুরআন বলেছেঃ "হে নবী! বলুন এটা তোমাদের নিজেদের কারণে।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ১৬৫)

হুনাইনের যুদ্ধে যখন কিছু সংখ্যক মুসলমানরা বললেনঃ 'আমরা অল্প হলেও হারব না', তখনই হল শোচনীয় পরাজয়। তাকে তিরস্কৃত করে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"হুনাইনের দিন যখন তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা তোমাদেরকে অহঙ্কারে স্ফীত করে তুলেছিল, তখন তা তোমাদের কোন উপকার দেয়নি।" (সূরা তাওবা ৯ঃ ২৫)

৮) উমর (রাঃ) যুদ্ধের নেতা সাদ (রাঃ)-কে ইরাকে লিখলেনঃ এটা তোমরা বল না আমাদের শত্রুরা আমাদের থেকে নিকৃষ্ট তাই কখনোই আমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না, বরং তারা হয়ত তাদের থেকে কোন খারাপ জাতির উপর জয়যুক্ত হবে- যেমনভাবে বনী ইসরাঈলের উপর কাফের অগ্নি উপাসকরা জয়যুক্ত হয়েছিল যখন তারা পাপে লিপ্ত হয়েছিল। তাই তোমাদের নিজের জন্য আল্লাহ্র (সুব) কাছে পাপ হতে বাঁচার জন্য সাহায্য চাও, যেমন তাঁর কাছে তোমরা সাহায্য চাও তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে।

মিলাদুন্নবী

আজকাল দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ মিলাদের দিনেই কোন খারাপ কার্য বা বেদ'য়াত বা ধর্মের পরিপন্থী কাজ করা হচ্ছে এবং এই মিলাদের উৎসব না রাসূল (সঃ), না সাহাবীরা, না তাবেয়ীরা করেছিলেন। আর না আছে তাতে শরীয়তের কোন দলীল।

১) মিলাদ উদযাপনকারীদের বহু লোকই শির্কে পতিত হয়। তা হল যখন তারা বলতে থাকে, "হে রাসূল (সঃ) বিপদ হতে উদ্ধার করুন, সাহায্য করুন হে রাসূলুল্লাহ, আপনার উপর ভরসা, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করুন, যখনই আপনাকে দেখি তখন দুঃখ দূর হয়ে যায়।" যদি নবী (সঃ) এই কথা শুনতেন তবে একে বড় শির্ক বলে আখ্যায়িত করতেন। কারণ বিপদ মুক্তি, ভরসা এবং কষ্ট মুসিবত দূর করা একমাত্র আল্লাহ্র (সুব) অধিকারে। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"হে নবী বলুনঃ আমিতো তোমাদের খারাপ বা ভাল করার দায়িত্ব নেইনি।" (সূরা জ্বীন ৭২ঃ ২১)

অন্যত্র নবী (সঃ) বলেনঃ *"যদি কিছু চাও তবে আল্লাহ্র (সুব) চাও এবং যদি সাহায্য চাও তবে তাঁর কাছেই চাও।"* (হাসান সহীহ)

২) বেশির ভাগ মিলাদেই দেখা যায় বাড়াবাড়ি কথা। আর সাথে সাথে নবী (সঃ)-এর প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা হয়। তা সম্বন্ধে তিনি এই বলে নিষেধ করে গেছেনঃ

"আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। আমিতো একজন দাস। তাই বল, আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর রাসূল।" (সহীহ বুখারী)

৩) মিলাদের দিন এই কথা বলা হয় যে, আল্লাহ্ (সুব) নবী (সঃ)-কে তাঁর নূর হতে পয়দা করেছেন এবং নবী (সঃ)-এর নূর হতে বাকী সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেঃ

"হে নবী আপনি বলুনঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার কাছে অহী পাঠানো হয় এই বলে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ ১১০)

সবাই এটা জানে যে, নবী (সঃ) বাপ ও মা হতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানুষ কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব হল তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে। মিলাদের দিন আরো বলা হয় যে, আল্লাহ্ (সুব) মুহাম্মদ (সঃ) -এর কারণে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন তাদের কথাকে মিথ্যা বলছেঃ "আমি মানুষ ও জ্বিনকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)

৪) খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন করে এবং ব্যক্তিগত জন্মবার্ষিকীও পালন করে। তাদের থেকেই মুসলমানরা এই বেদ'য়াতকে গ্রহণ করেছে। ফলে নবী (সঃ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন করে এবং নিজেরও জন্মবার্ষিকী পালন করে। রাসূল (সঃ) তাদেরকে সাবধান করে বলেছেনঃ *"যে লোক অন্য জাতির রঙ্গে নিজেকে রঞ্জিত করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"* (সহীহ, আবু দাউদ)

৫) দেখা যায় মিলাদের দিন বহু মেয়ে লোক ও পুরুষ লোক একত্রে মিলিত হয়, যাকে ইসলাম হারাম বলেছে।

৬) মিলাদের দিনে উৎসবের সাজ সজ্জার জন্য যে টাকা পয়সা খরচ করা হয় তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। তা কোন উপকার ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায়। উপকার হয় শুধু কাফেরদের যাদের থেকে উৎসবের এই রঙিন কাগজ ও মোমবাদি ইত্যাদি খরিদ করা হয়। নবী (সঃ) টাকা পয়সা নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

৭) মানুষ যে সময়গুলি নষ্ট করে এই আনন্দ ফুর্তির মধ্যে, দেখা যায় প্রায়ই তারা সালাতকে বাদ দিয়ে দেয়।

৮) দেখা যায় মিলাদের শেষের দিকে লোকেরা কিয়াম করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, নবী (সঃ) ওখানে উপস্থিত হয়েছেন। তা পরিষ্কার মিথ্যা। আনাস (রাঃ) হতে হাদিস বর্ণিতঃ

"সাহাবায়ে কেরামদের কাছে নবী (সঃ) হতে অন্য কোন ব্যক্তি অধিক প্রিয় ছিল না। যখন তারা তাঁকে দেখতেন তাঁর জন্য খাড়া হতেন না; এ জন্য নবী এটা পছন্দ করতেন না।" (সহীহ, আহমদ ও তিরমিযী)

৯) তাদের মধ্যে কেউ বলে আমরা নবী (সঃ)-এর জীবনী পড়ি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা এমন সব কাজ করেছে যা তাঁর কথার বিপরীত ও জীবনীরও বিপরীত। আর তাঁকে যে ভালবাসে সে তো তাঁর জীবনী প্রত্যহই পাঠ করে; না প্রত্যেক বৎসরে একবার মাত্র। এটাও জানা দরকার এই রবিউল আউয়াল যাতে নবী (সঃ)-এর জন্ম হয়, তাতে তার ওফাতও হয়। এই মাসে কি খুশী হওয়ার থেকে দুঃখিত হওয়াই বেশি বাঞ্ছনীয় নয়।

১০) মিলাদকারীদের দেখা যায় প্রায়ই বেশি রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। ফলে তাদের ফজরের জামাত পর্যন্ত নষ্ট হয় অথবা সালাতই নষ্ট হয়ে যায়।

১১) বেশির ভাগ লোক মিলাদ পড়লেই যে তা শরীয়ত সিদ্ধ হবে তার কোন মানে নেই। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"যদি তুমি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোক যা করে তার অনুসরণ কর তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হতে গোমরাহ দেবে।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১১৬)

হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক বেদ'আতই গোমরাহী যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলুক না কেন।

১২) প্রথম যে মিলাদের প্রবর্তন করে তার নাম বাদশাহ মোজাফ্‌ফর যিনি সিরিয়াতে ছিলেন সপ্তত শতাব্দীর প্রথম দিকে। এটা মিশরে যারা প্রথম শুরু করে তারা হল ফাতেমীরা। যাদেরকে ইবন কাসীর বলেনঃ কাফের ও ফাসেক। আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে সাহায্য চাই যাতে তিনি আমাদের এই বেদয়াত হতে বাঁচান। (আমীন)

আল্লাহ্ (সুব) ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত

১) আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "হে নবী আপনি বলেনঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ্ (সুব) তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ (সুব) অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা আলি-ইমরান ৩ঃ ৩১)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে বেশি ভালবাসার পাত্র হই।"* (সহীহ বুখারী)

২) এ আয়াত আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, আল্লাহ্‌র (সুব) মহব্বত একমাত্র নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে। তিনি যা হুকুম করেছেন তা মান্য করার মধ্যেই। যা করতে নিষেধ করেছেন তা ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে। যা আমরা সহীহ হাদীসের মধ্যে পাই

যা তিনি মানুষের জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। মুখের কথার দ্বারা কখনই মহব্বত হতে পারে না, তাঁর কথার উপর আমল করা ব্যতীত এবং তাঁর হুকুম পালন ব্যতীত ও তাঁর সুন্নাত মত নিজেকে গড়া ব্যতীত।

৩) সহীহ হাদীস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, মুসলমানের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না নবী (সঃ)-কে ভালবাসে নিজের ছেলে, বাপ ও মানুষের প্রতি ভালবাসার থেকে বেশি। এমনকি তাঁকে নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালবাসবে। যেভাবে অন্য হাদীসে এসেছে। সত্যই তাঁকে নিজের জীবনের থেকে বেশি হচ্ছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন নবী (সঃ)-এর হুকুমের ও নিষেধের বিরুদ্ধে নিজের নফসের খায়েশকে কুরবানী করা হয়; নিজের স্ত্রী, সন্তান ও চারিপার্শ্বের মানুষদের থেকে যদি বেশি ভালবাসা হয়, যদি সে সত্যিকারের নবীর আশেক হয় তবে সে তাঁর হুকুম আহকামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং নিজের প্রবৃত্তি ও পরিবারের ভালবাসার বিরোধিতা করে এবং চারিপার্শ্বের অন্যদেরও। যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা করে, নিজের খায়েশ ও শয়তানের আনুগত্য করে।

৪) যদি কোন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি নবীকে ভালবাসো? সাথে সাথে বলবে, হ্যাঁ, তার জন্য আমার জান ও মাল কুরবান হোক। তখন যদি বলা হয় তাহলে দাড়ি কাট এবং তাঁর হুকুমের বাহিরে চল, আর তার সাথে কেন তোমার বাহ্যিক রূপকে মিলাও না, চরিত্রকে মিলাও না, এমন কি তাঁর একত্ববাদের সাথে নিজকে মিলাও না। তখন সে তোমাকে উত্তর দিবেঃ 'ভালবাসা অন্তরের মধ্যে এবং আমার অন্তর পবিত্র, আল-হামদুলিল্লাহ'। আমরা তাকে বলিঃ 'যদি তোমার দিল সাফ থাকে তবে অবশ্যই তা তোমার শরীরে প্রকাশ পাবে।' কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"ওহে শরীরের ভিতরে এমন একটা অঙ্গ আছে যদি তা ঠিক হয়ে যায় তবে পুরা শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, পুরা শরীরই নষ্ট হয়ে যায়, আর তা হল কলব বা অন্তর।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৫) লেখক বলছেনঃ একবার আমি এক মুসলমান ডাক্তারের চেম্বার প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তার দেয়ালে পুরুষ ও মেয়েদের ছবি ঝুলানো। তখন তাকে বললাম, নবী (সঃ) ছবি ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। তখন সে এই বলে আমাকে অস্বীকার করল যে, এরা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথীরা। এটা জেনেও যে তারা বেশির ভাগই কাফের। বিশেষ করে ঐ মেয়েরা যারা চুলকে খোলা রেখেছেন এবং তাদের সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে এবং তারা কম্যুনিস্ট দেশের। এই ডাক্তার দাড়ি কাটা। তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললাম, এতে গুনাহ হবে। তখন সে বললঃ মৃত্যু পর্যন্তও আমি দাড়ি রাখব না। কিন্তু বড়ই অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, এ ডাক্তার যিনি নবী (সঃ)-এর শিক্ষার বিপরীত চলেছেন। তিনি নবী (সঃ)-এর প্রতি তার মিথ্যা ভালবাসার দাবি করেন এবং আমাকে বলেনঃ বল হে আল্লাহ্ রাসূল, আমি আপনার সীমার মধ্যে। মনে মনে বললামঃ তুমি নবী (সঃ)-এর হুকুম অমান্য কর এবং তারপর তাঁর সীমার মধ্যে প্রবেশ কর। নবী (সঃ) কি এই জাতীয় শির্‌কে খুশী হন?

৬) নবী (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা শুধু তাঁর মিলাদ পড়ার মধ্যে না এবং নাত পড়ার মধ্যে না যাতে অনেক ধর্ম বিরোধী কথা থাকে এবং অন্যান্য বেদ'আত থাকে যার কোন হুকুম নাই। ভালবাসার প্রমাণ হল তার হেদায়াত মত চলা এবং সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর শিক্ষা জীবনের সর্ব অংশে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে।

নবী করীম (সঃ)-এর উপর দরূদের ফযীলত

আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আলস্নাহ (সুব) ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পড়ে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়।" (সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৫৬)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আবু আলীয়া হতেঃ আল্লাহ্র (সুব) সালাত হচ্ছে ফেরেশতাদের কাছে তাঁর (নবীর) প্রশংসা করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ হচ্ছে দোয়া। ইব্নে আব্বাস (রহ) বলেন, দরূদ পড়ার অর্থ হল বরকত পাঠানো। এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইব্নে কাসীর (রহঃ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) তাঁর বান্দাদের জানাচ্ছেন তাঁর বান্দার সম্মান এবং তাঁর নবীর নিকটতম ফেরেশতাদের কাছে। এই বলে যে, তিনি তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা করেন ফেরেশতাদের কাছে। এই বলে যে, তিনি তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা করেন ফেরেস্তাদের কাছে আর ফেরেস্তারাও তাঁর জন্য দোয়া করেন। তারপর আল্লাহ্ (সুব) দুনিয়াবাসীদের হুকুম করেছেন তাঁর উপর দরূদ পড়তে যাতে তাঁর উপর সমবিশ্বাসীদের প্রশংসা একত্রিত হয়।

১) এই আয়াতে আল্লাহ্ (সুব) আমাদের হুকুম করেছেন রাসূল (সঃ)-এর জন্য দোয়া চাইতে অথবা তাঁর উপর সালাম পড়তে। বলেননি, আল্লাহ্কে ছেড়ে তাঁর কাছে দোয়া চাইতে অথবা তাঁর উপর ফাতিহা পাঠ করতে, যা অনেকে করে থাকে।

২) সবচেয়ে উত্তম দরূদ হচ্ছে যা নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন, যখন তারা জানতে চেয়েছিলেন।

"বল! [হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং তাঁর আসহাবের উপর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত পাঠাও যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।]" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৩) এ দরূদ এবং অন্যান্য দরূদ যা হাদীস গ্রন্থে আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য ফেকার গ্রন্থে আছে। তাতে সাইয়েদ শব্দটা নেই যা বহু লোক যোগ করে থাকেন। অবশ্যই তুমি আমাদের সরদার।

কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সঃ) যেভাবে বলেছেন সেভাবে বলাই ওয়াজিব। ইবাদত রেওয়ায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত, নিজের রায়ের উপর নয়।

৪) নবী (সঃ) বলেছেনঃ

"যখন তোমরা মোয়াজ্জেনকে আযান দিতে শোন, সে যা বলে তোমরাও তা বল, তারপর আমার উপর দরূদ পড়। কারণ, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ্ (সুব) তার উপর দশবার রহমত পাঠান। তারপর আলস্নাহর কাছে আমার ওসীলা চাও। তা জান্নাতের একটা বিশেষ সম্মানিত জায়গা। তা একমাত্র আল্লাহ্র (সুব) খাস বান্দার জন্য এবং আশা করি আমিই সেই খাস বান্দা। তাই যে আমার জন্য ওসীলা চাবে, তার জন্য শাফায়াত করা আমার জন্য জরুরী হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম)

ওসীলার যে দোয়া আজানের পর এবং নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার পর আস্তে আস্তে পড়ার কথা রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে তা হলঃ

"হে আল্লাহ্! তুমিই এই পরিপূর্ণ দাওয়াতের এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব। মুহাম্মদ-কে দাও ওসীলা ও ফযীলত। এবং তাঁকে দাও প্রশংসিত স্থান যা তুমি ওয়াদা করেছ।" (সহীহ বুখারী)

৫) নবী (সঃ) এর উপর প্রত্যেক দোয়ার সময় দরূদ পড়া দরকার। কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"প্রত্যেক দোয়াই ঠেকে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী (সঃ)-এর দরূদ পড়া হয়।" (হাসান বায়হাকীর রেওয়ায়াত)

নবী (সঃ) আরও বলেনঃ *"আল্লাহ্র (সুব) দুনিয়া জুড়ে ঘুরে বেড়ানো একদল ফেরেশ্তা আছে। তারা আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছায়।"* (সহীহ, আহমদ)

নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়া অত্যন্ত দরকারী, বিশেষ করে জুমার দিনে। তা আল্লাহ্র নিকটবর্তীকারক আমলের একটি। দরূদের দ্বারা ওসীলা বানানো শরীয়ত সম্মত। কারণ, তা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। এই বলা- হে আল্লাহ্! তোমার নবীর (সঃ)-এর উপর দরূদের ওসীলায় আমার বিপদ দূর কর।

বেদআতী দরূদ

আজকাল অনেকের মুখে নানা ধরনের বেদয়াতী দরূদ শুনতে পাওয়া যায়, যা নবী (সঃ) অথবা তাঁর সাহাবীগণ হতে রেওয়াত নেই আর না তাবেঈনগণ হতে, না চার ইমাম হতে। বরঞ্চ পরের জামানার কিছু বুজুর্গানের বানানো। এ সমস্ত দরূদগুলো সাধারণ মানুষ ও আলেমদের মধ্যে বহু প্রচলিত। ফলে, তারা এ দরূদগুলো যা তাঁর থেকে সাবেত আছে, তার চেয়ে বেশি পড়ে। সম্ভবত অনেকেই সহীহ দরূদকে ছেড়ে দিয়েছে এবং বুজুর্গানের নামে তৈরি এ দরূদগুলোকে প্রচার করা হয়। যদি আমরা খুব সূক্ষভাবে এ সমস্ত দরূদের প্রতি দৃষ্টি দেই তবে দেখা যাবে যে, তা নবী (সঃ)-এর রাস্তার বিপরিত। যেমন - হে আল্লাহ্! ঐ নবীর উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যিনি অন্তরের শান্তি, তার ঔষধ, শরীরের সুস্থতা এবং তার শেফা, চোখের নূর এবং তার আলো। কিন্তু শরীর অন্তর ও চোখের রোগ উপশমকারী ও সুস্থতা দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূল (সঃ) তাঁর নিজের ভাল করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখতেন না। যা কুরআনে আছেঃ

"বল, আমি তো আল্লাহ্র (সুব) ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতাও রাখি না।" (সূরা আরাফ ৭ঃ ১৮৮)

নবী (সঃ) বলেনঃ *"তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশংসা কর না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে করে থাকে। আমি তো শুধু একজন দাস। বলঃ আল্লাহ্র বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।"* (সহীহ বুখারী)

অন্য একটিতে বলা হয়েছেঃ "সালাম ও সালাত আপনার উপর হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তাই আমাকে উদ্ধার করেন হে আল্লাহ্র দোস্ত।" এর প্রথম অংশ ঠিক, কিন্তু শেষ অংশ শির্কযুক্ত।

কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "আর কে আছে যে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয়- যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদ হতে উদ্ধার করে (আল্লাহ্ ছাড়া)।" (সূরা নামল ২৭ঃ ৬২)

অন্যত্র বলেন–"যদি তুমি কোন কষ্টে পতিত হও, তবে তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১৭)

যখন নবী (সঃ)-এর উপর কোন দুঃখ দুশ্চিন্তা আপতিত হত তখন তিনি বলতেন– *"হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ার অসিলায় বিপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছি।"* (হাসান, তিরমিযী বর্ণিত)

তাই কিভাবে আমরা বলি, রাসূল (সঃ) আমাদের উদ্ধার করেন এবং বাঁচান? এটি রাসূলুলস্নাহ (সঃ)-এর ঐ কথারও বিপরিত যাতে তিনি বলেন– *"যদি কিছু চাও, তবে আল্লাহ্র কাছেই চাও, আর যদি সাহায্য চাও তবে তাঁর কাছেই চাও।"* (হাসান, সহীহ, তিরমিযী)

আস সালাতু নারিয়া (দরূদে নারিয়া)

এই ধরনের দরূদ বহু মানুষের নিকট অতি পরিচিত। এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তা ৪৪৪৪ বার পাঠ করবে সে সমস্ত বালা মুসিবত থেকে রক্ষা পাবে এবং তার যে কোন ধরনের অভাব অভিযোগ পূরণ হবে।

কিন্তু এ সমস্ত ধারণা বাতিল ধারণা। এর সপক্ষে কোন সহীহ দলিল প্রমাণ নেই। যদি আমরা দরূদের ব্যাখ্যা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পারো যে তা শির্কী কথা দ্বারা পূর্ণ।

“হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর পরিপূর্ণ দরূদ এবং সালাম পৌঁছান, যার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম) কারণে সমস্ত কঠিন বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় এবং সব ধরনের বালামসিবত দূর হয় এবং যার কারণে সমস্ত ধরনের হাযত পূরণ হয়। তাঁর কারণেই সমস্ত আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হয় এবং তাঁর কারণেই ঈমান অবস্থায় মানুষের মৃত্যু হয়। তাঁর নামের অসিলায় বৃষ্টিপাত হয় এবং তাঁর আহল এবং সাহাবীদের উপর ঐ পরিমাণ দরূদ ও সালাম পাঠান যে পরিমাণ আপনার জ্ঞানে আছে।” (নাউযুবিল্লাহ)

১) পবিত্র কুরআন থেকে আমরা যে তাওহীদের শিক্ষা পাই এবং রাসূল (সঃ) আমাদের যে আক্বিদা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে প্রত্যেক মুসলিমের এই বিশ্বাস পোষণ করা জরুরী যে, প্রত্যেক মানুষের উপর আপতিত বিপদাপদ, বালা মুসিবত দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত। সমস্ত ধরনের হাযত (প্রয়োজন) পূরণ করার মালিক তিনিই এবং দোয়া কবুল করার ইখতিয়ারও তাঁরই হাতে। কোন মুসলিমের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুঃখ-পেরেশানী অথবা অসুস্থতা দূর করার জন্য দোয়া করবে, হোক না তিনি আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফেরেশ্তা (মালাইকা) অথবা রাসূল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে হোক না তিনি নবী, রাসূল অথবা অন্য কারও কাছে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত আয়াতঃ

“(হে নবী) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাকে মা'বুদ বলে ধারণা করছ এবং তাদের নিকট দোয়া করছ, তাদের কাছে যতই দোয়া কর না কেন, তারা না পারবে তোমাদের দুঃখ কষ্ট করতে, আর না পারবে তোমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট তা ফিরিয়ে নিতে। বরঞ্চ যারা তাদের রবের কাছে দোয়া করে এবং তার নিকটেই অসিলা প্রার্থনা করে, তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং তার আযাবের ভয়ে ভীত হয়, তারাই হচ্ছে নৈকট্য হাসিলকারী। নিশ্চয়ই তোমার রবের আযাব বড়ই শক্ত।” (সূরা ইসরা ১৭ঃ ৫৬)

মুফাসসিরগণ বলেন, এই আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে করে নাযিল হয়েছে যারা মসীহ ইব্নে মরিয়ম, ঈসা (আঃ)-এর নিকট অথবা ফেরেশতাদের (মালাইকা) নিকট কিংবা নেককার জ্বীনদের নিকট দোয়া করত।

২) কিভাবে রাসূল (সঃ) এই কথার উপর খুশী হতে পারেন যাতে বলা হয়েছে তিনিই কঠিন কাজ ও বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন, যে সমস্ত ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছেঃ “(হে নবী) আপনি বলুন, আমি আমার নিজের ভাল কিংবা মন্দ কোন কিছু করারই মালিক নই। একমাত্র আল্লাহ্ (সুব) যা চান তাই হবে। আমি যদি গায়েবের খবরই জানতাম, তবে বেশি বেশি ভাল জিনিস পছন্দ করতাম এবং আমাকে কখনই কোন খারাবী স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভয় প্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান এনেছে।” (সূরা আরাফ ৭ঃ ১৮৮)

“একদা এক ব্যক্তি রাসূল [সাঃ] এর কাছে এসে বলেন, আল্লাহ্ (সুব) যা চান এবং আপনি যা চান। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানাতে চাও? বরং, বল, আল্লাহ্ (সুব) নিজে যা চান তাই তাই হবে।” (নাসাঈ, হাসান)

৩) আমরা কেন এ ধরনের বেদআতী দরূদ পড়ব যা মানুষের নিজেদের বানানো এবং রাসূল হতে যে দরূদে ইব্রাহীম (আঃ) শিক্ষা পেয়েছি (যা আমরা সালাতে পড়ি) তা কেন পড়ব না?

আল-কুরআন জীবিতদের জন্য- মৃতদের জন্য নয়

আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ “এ বরকতময় কিতাব আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, যাতে তারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তারা যেন এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।” (সূরা ছোয়াদ ৩৮ঃ ২৯)

সাহাবা কেরামগণ (রাঃ) কুরআনের হুকুম ও নিষেধ-এর আমল করতেন। একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। ফলে, দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সৌভাগ্যশালী হয়েছিলেন। যখন থেকে মুসলমানরা এই কুরআনের শিক্ষাকে ছেড়ে দেয়া শুরু করল, মৃতদের জন্য করবের উপর এবং দুঃখের দিনে তা পড়তে শুরু করল, তখন থেকেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করল এবং তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হতে শুরু হল। তাদের জন্য সত্যিই আল্লাহ্র (সুব) নিম্নোক্ত কথা প্রযোজ্যঃ

“রাসূল (সঃ) বলবেনঃ হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।” (সূরা ফুরকান ২৫ঃ ৩০)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) একে অবতীর্ণ করেছেন জীবিতদের জন্য যাকে তারা তাদের জীবদ্দশায় আমল করতে পারে। তা মৃতদের জন্য নয়। কারণ তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তারা আর তা পড়তেও পারে না, আমলও করতে পারে না এবং কুরআন পড়ার কোন সওয়াবও তাদের কাছ পৌঁছে না, একমাত্র তার সন্তানদের পড়া ব্যতীত। কারণ সেই তারই ঔরসজাত পুত্র। নবী (সঃ) বলেন-

“যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত। ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) ইল্ম, যার দ্বারা অন্যের উপকার হয় ৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্র (সুব) বাণীঃ “মানুষ যা করবে শুধুমাত্র তারই প্রতিফল ভোগ করবে।” (সূরা নাজ্ম ৫৩ঃ ৩৯)

ইব্নে কাসীর এর তাফসীরে বলেনঃ যেমন তার উপর অন্যের গুনাহ অর্পিত হবে না, তেমনি অপরের সওয়াব সে পাবে না। এ আয়াত থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমাণ বের করেন যে, কুরআন তেলাওয়াত করে তার সওয়াব মৃতদের নামে উৎসর্গ করলে তা পৌঁছে না। কারণ তা তাদের আমল না। অথবা উপার্জনও না। যার কারণে নবী (সঃ) এটাকে উম্মতের জন্য সুন্নাত বানিয়ে যাননি। অথবা তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি এবং এ ব্যাপারে কোন ইশারাও করেননি। অথবা সাহাবীরা কেউ এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। যদি এটা ভালই হত তবে অবশ্যই তাঁরা তা করতেন। দোয়া ও সাদাকা বা দান খয়রাত-এর সওয়াব পৌঁছাবে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই এবং তাতে দলিলও আছে।

১) আজ মৃত ব্যক্তির নিকটে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা একটা রসম রেওয়াজ পরিণত হয়েছে। এমনকি কোন বাড়ি থেকে কয়েকজনের মিলিত তেলাওয়াত শুনলে মনে হয় কেউ ওখানে মারা গেছে। যদি রেড়িওতে সারা দিন ধরে কুরআন তেলাওয়াত শুনা যায় তবে বুঝতে হবে কোন নেতা মারা গেছেন। লেখন বলেন- একবার কোন এক ব্যক্তি কোন এক অসুস্থ বাচ্চাকে দেখতে যেয়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন। শুনামাত্র বাচ্চার মা চেঁচিয়ে উঠেন- এখনও মারা যায়নি কিভাবে তুমি কুরআন পড়ছ?

২) যে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সালাত ত্যাগ করেছে, তার জন্য মৃত্যুর পর কুরআন পড়লে তার কি লাভ হবে? কারণ, তাকে তো আযাবের খবর দেয়া হয়েছে।

"ঐ সমস্ত সালাতীদের জন্য ধ্বংস যারা সালাতের ব্যাপারে অলসতা করে।" (সূরা মাউন ১০৭ঃ ৪-৫)

৩) যে হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমাদের মৃতদের উপর ইয়াসিন সূরা পড়" তা বানানো হাদীস। দারাকুতনী বলেন- দুর্বল সনদ এবং মূল কথাও দুর্বল। নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে এমন কোন দলিল নেই যে, তাঁরা মৃতের উপরে কুরআন পড়েছেন। না সূরা ইয়াসিন না ফাতিহা। অথবা কুরআনের অন্য কোন অংশ। বরং দেখা যায়, নবী (সঃ) তার সাহাবীদের বলতেন-

"দাফনের পর তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাফ চাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য ঈমান দৃঢ়তা চাও। কারণ, তাকে তখন প্রশ্ন করা হবে।" (সহীহ, আবু দাউদ)

৪) নবী (সঃ) কোন সাহাবীকে শিখান নাই যে, কবরে ঢুকার সময় সূরা ফাতিহা পড়বে। বরঞ্চ বলেছেনঃ

"হে ঘরের মু'মিন বাসিন্দাগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ্‌ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে তোমাদের এবং তোমাদের জন্য তাঁর আযাব হতে মাফ চাই।" (সহীহ মুসলিম)

এ হাদিসআমাদের এই শিড়্গা দিচ্ছে যে, মৃতদের জন্য আমরা দোয়া করব, তাদের কাছে দোয়া বা সাহায্য চাইব না।

৫) আল্লাহ্‌ (সুব) কুরআনকে এজন্য নাযিল করেছেন যাতে জীবিতরা আমল করতে পারে। আল্লাহ্‌ (সুব) বলেনঃ

"এ জন্য যে, যারা জীবিত তাদেরকে যেন ভয় দেখানো হয় আর কাফিরদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা ঘটবেই।" (সূরা ইয়াছিন ৩৬ঃ ৭০)

যে ধরনের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ

আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলেনঃ

"যে লোক এটা চায় যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়াক সে যেন তার ঠিকানা আগুনে করে নেয়।" (সহীহ, আহমদ)

আনাস (রাঃ) বলেন– *"সাহাবীদের কাছে নবী (সঃ) থেকে কোন ব্যক্তি বেশি প্রিয় ছিলেন না, তথাপি তাঁরা তাঁকে দেখলে দাঁড়াতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।"* (সহীহ, তিরমিযী)

১) এ দু'টি হাদীস হতে এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলাম এটা পছন্দ করে, যে মানুষ তার জন্য দাঁড়াবে (তার উপস্থিতি সময়), তবে এ কাজ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবে। সাহাবায়ে কেয়াম (রাঃ) নবী (সঃ) কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে দেখতেন তাদের সামনে আসতে, দাঁড়াতেন না। কারণ, এ দাঁড়ানোকে তিনি খুব অপছন্দ করতেন।

২) মানুষ একে অপরের জন্য দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে যখন উস্তাদ শিক্ষা দিতে কক্ষে প্রবেশ করেন। অথবা কোন জায়গা দেখতে যান। সে রকম শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন, সাথে সাথে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান করে। যে দাঁড়ায় না তাকে তিরস্কৃত ও ধিকৃত করা হয়। দন্ডায়মানকালে শুরু ও শিক্ষকের নীরবতা অথবা দাঁড়ানোর বিরোধী ছাত্রকে তিরস্কার করা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা দাঁড়ানো পছন্দ করে। যদি অপছন্দ করত তবে এই হাদীসগুলো বলে বুঝাত। এভাবে বারে বারে তার জন্য দাঁড়ানোতে তার অন্তরে চায় যে ছাত্ররা দাঁড়াক। যদি কেউ না দাঁড়ায় তবে তার প্রতি অন্তরে বিরূপ ধারণা আসে। ঐ সমস্ত লোক যারা দাঁড়াচ্ছে, তারা ঐ মানুষ শয়তানের সাহায্যকারী, যে নিজের জন্য এভাবে দাঁড়ানো পছন্দ করে। কিন্তু নবী (সঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেনঃ

"তোমাদের ভাইয়ের ব্যাপারে তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হইও না।" (সহীহ বুখারী)

৩) অনেকে বলেনঃ আমরা শিক্ষক বা বুজুর্গ-এর সম্মানে নয় বরং তার ইল্‌মের সম্মানে দাঁড়াই। আমরা বলবঃ তোমাদের কি রাসূল (সঃ)-এর ইল্‌ম এবং তার সাথে সাহাবীদের আদব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে? এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। ইসলাম এভাবে দাঁড়ানোকে সম্মান বলে মনে করে না, বরং হুকুম মানা ও আনুগত্যের মধ্যেই সম্মান। সালাম করা ও হাত মিলানোই সম্মান।

৪) অনেক সময় দেখা যায়, লোকেরা কোন মজলিসে বসা। তখন কোন ধনী লোক আসলে মানুষ তার সম্মানে দাঁড়ায়, কিন্তু দরিদ্র আসলে কেউ দাঁড়ায় না। ফলে তার মনে হিংসার আগুন জ্বলে। এমনও হতে পারে, এ দরিদ্রদের সম্মান আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে ঐ বড় লোকদের থেকে বেশি। কারণ,আল্লাহ্‌ (সুব) বলেন–

"তোমাদের মধ্যে ঐ লোক আল্লাহ্‌র (সুব) কাছে বেশি সম্মানী যে যত বেশি আল্লাহ্‌ ভীরু।" (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ ১৩)

অনেকে ভাবে, যদি আমরা না দাঁড়াই তবে আগমনকারী মনে ব্যথা পাবেন। তাদের এই বলে বুঝানো দরকার যে, দাঁড়ানোটাই সুন্নাতের বিপরীত। হাতে মিলান, সালাম করাই সুন্নাত।

যে ধরনের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত এবং পছন্দনীয়

অনেক সহীহ হাদীসে আছে এবং সাহাবীদের আমল দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আগমনকারীর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ানো জায়েয। আসুন আমরা এ হাদীসসমূহ বুঝতে চেষ্টা করি।

১) নবী (সঃ) তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্য দাঁড়াতেন যখন তিনি আব্বাজানের খেদমতে আসতেন এবং যখন নবী (সঃ) তাঁর কাছে যেতেন, তখন তিনিও উঠে দাঁড়াতেন। এটা জায়েয এবং দরকারী। কারণ, অতিথির সাথে সাক্ষাৎ ও তার সম্মানের জন্য। নবী (সঃ) বলেছেনঃ *"যে আলল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২) অন্য হাদীসে আছেঃ *"তোমাদের সর্দারের জন্য দাঁড়াও।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। অন্য রেওয়াতে আছেঃ *"এবং তাকে নামাও!"*

এ হাদীসের কারণ হলঃ সাদ (রাঃ) আহত ছিলেন। তাকে নবী (সঃ) বলেছিলেন ইহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার জন্য। ফলে গাধার উপর উঠলেন। যখন পৌছালেন, তখন নবী (সঃ) বললেনঃ তোমরা তোমাদের সর্দারের জন্য উঠ এবং তাকে নামাও। ফলে তারা দাঁড়ালেন এবং তাকে নামালেন। এটা প্রয়োজন ছিল আনসারদের সর্দার সা'দ (রাঃ)-কে সাহায্য করার জন্য। তার তিনি ছিলেন আহত, গাধার পিঠে সওয়ার যাতে পড়ে না যান। রাসূল (সঃ) কিন্তু উঠেন নাই এবং অন্য সাহাবীরাও দাঁড়ান নাই।

৩) সাহাবী কা'ব ইব্নে মালেক (রাঃ) সম্বন্ধে ঘটনা আছে, যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবীরা বসা ছিলেন। তখন তাঁকে তাঁর তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দিতে একমাত্র তালহা (রাঃ) উঠে গেলেন। তবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে এটা ঘটেছিল। এটা জায়েয। কারণ এতে বিমর্ষ ব্যক্তিকে খুশী করার চেষ্টা ছিল তার তওবা যে কবুল হচ্ছে সেই তার সুসংবাদ জানানোর জন্য।

দুর্বল ও মউদ্বু হাদীস

যে সমস্ত হাদীস রাসূল (সঃ)-এর থেকে বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে সহীহ, হাসান, দুর্বল, মউদ্বু বা বানানো হাদীস। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমের ভূমিকাতে "যে সমস্ত হাদীস শোনা হয় তার সবগুলোই নির্বিচারে বলা নিষিদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়টি" উল্লেখ করেছেন, যাতে দুর্বল হাদীস সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি রাসূল (সঃ)-এর হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেনঃ

"মিথ্যে হিসেবে মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা-ই বর্ণনা করবে।" (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নওভী (রহঃ) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে "দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করা নিষেধ-এর অধ্যায়টি" উল্লেখ করেছেন।

তাঁর দলিলঃ *"শেষ জামানায় আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা এমন সহীহ হাদীস বলতে থাকবে যা তোমরা কখনও শুন নাই, অথবা তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনে নাই। তাই তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধানে থেক।"* (সহীহ মুসলিম)

ইব্নে হিব্বান (রহঃ) তাঁর সহীহ হাদীসের গ্রন্থে বলেছেন- "ঐ লোকের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করা ওয়াজিব যে নবী (সঃ)-এর সাথে এমন কথা যুক্ত করল যার সত্যতা সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। তারপর নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ *"যা আমি বলি নাই, সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে করে নেয়।"* (হাসান)

নবী (সঃ) উম্মতের মউদ্বু হাদীস সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে–

"যে ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে সে যেন আগুনে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বহু বুজুর্গ এ জাতীয় হাদীস নিয়ে আলোচনা করেন তাদের মাযহাবকে ও চিন্তা ভাবনাকে সাহায্য করার জন্য। এ হাদীসের মধ্যে এটাও বলেন-"আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমত স্বরূপ।"

আল্লামা ইব্নে হাজম (রহঃ) বলেন, এটা কোন হাদীসই নয়, বরঞ্চ তা বাতিল মিথ্যা, বানানো। যদি মতবিরোধ রহমত হয় তবে মতৈক্য হবে অভিশাপ। আর তা কোন মুসলমান কখনও বলবে না। অন্য আর একটা মউদ্বু হাদীস (যাদু বিদ্যা শিখ কিন্তু তার আমল কর না) যে হাদীসটা মানুষের মুখে খুব প্রচারিত-

"বাচ্চাদের ও পাগলদের মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।" ইব্নে হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর মতে তা দুর্বল, ইব্নে আল জওযীর মতে সহীহ না। আব্দুল হক্বের মত অনুযায়ী ভিত্তিহীন।

কারণ সহীহ হাদীসে নবী (সঃ) বলেনঃ *"তোমাদের সন্তানদের সাত বৎসর হতেই সালাত শিখাও এবং তা না পড়লে ১০ বৎসর বয়স হতে প্রহার কর।"* (সহীহ, আহমদ হতে বর্ণিত)

আর তালিম মসজিদেই হবে, যেমন রাসূল (সঃ) তার সাহাবীদের সালাত শিখিয়েছিলেন মসজিদে মিম্বরের উপর বসে এবং বালকরাও মসজিদে ছিল এমনকি ছোটরাও ছিল।

১) শুধু এটা বলাই যথেষ্ট নয় যে, ইমাম তিরমিযী বা আবু দাউদ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল হাদীসও আছে, তাই সাথে সাথে হাদীসের স্তরও উল্লেখ করতে হবে। যেমনঃ সহীহ, হাসান বা দুর্বল। আর বুখারী ও মুসলিমে শুধু নাম বললেই চলবে কারণ তাঁদের হাদীস সব সহীহ।

২) দুর্বল হাদীসসমূহের রাসূল (সঃ) হতে সাবেত নেই, হয়ত সনদের বা মূল হাদীসের মধ্যে গন্ডগোল থাকার জন্য। আর আমাদের কেহ যদি বাজারে যায় এবং গোশত দেখে চর্বিওয়ালা ও হাড্ডিযুক্ত তবে অবশ্যই ভালটাই নিবে। এ দুর্বলটাকে বাদ দিবে। আর ইসলাম আমাদের হুকুম করেছে কুরবানীতে মোটা পশুতে দিতে এবং অসুস্থকে ত্যাগ করতে। তাই কিভাবে দ্বীনের মধ্যে দুর্বল হাদীস নেয়া জায়েজ হতে পারে? বিশেষ করে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। আলেমগণ বলেনঃ দুর্বল হাদীসে এটা বলা যাবে না, রাসূল (সঃ) বলেছেন। বরঞ্চ বলতে হবে বর্ণিত আছে, যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

৩) পরবর্তী যুগের কিছু আলেম দুর্বল হাদীস নেয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন। তা হলঃ

ক) তা শুধু আমলের ফযীলত হবে।

খ) এ ব্যাপারে মূল হুকুম সহীহ দ্বারা সাবেত থাকতে হবে।

গ) খুব বেশি দুর্বল হতে পারবে না।

ঘ) তার উপরে আমল করার সময় তা সাবেত বলে ধারণা করতে পারবে না।

কিন্তু মানুষ আজকের জামানায় দুর্বল হাদীসের ব্যপারে এ শর্তগুলো মেনে চলছে না।

কিছু মউদ্বু হাদীস বা বানোয়াট হাদীস

১) আল্লাহ্ (সুব) তাঁর নুর হতে এক মুঠ নুর নিয়ে বলেনঃ মোহাম্মদ হয়ে যাও, (ফলে হয়ে গেল)।

২) হে জাবের! প্রথমে আল্লাহ্ (সুব) সৃষ্টি করে তোমার নবীর নুর।

৩) আমার দ্বারা ওসীলা বানাও, কারণ আমার সম্মান আল্লাহ্র কাছে খুব বেশি।

৪) যে হজ্জ করল কিন্তু আমার জেয়ারত করল না, সে যেন আমার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করল।

এখানে আমরা (অনুবাদক) এখন সহীহ, হাসান ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব।

সহীহঃ তাতে ৫টি শর্ত থাকবেঃ

১) সনদযুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক রেওয়ায়েতকারী তার উপরের রেওয়ায়েতকারী হতে সরাসরি শুনেছেন।

২) প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে আদেল অর্থাৎ মুসলমান, বালেগ, ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী হতে হবে, ফাসেক এবং চরিত্রহীন হলে হবে না।

৩) রেওয়ায়েত মুখস্থ থাকতে হবে পূর্ণভাবে, কোন শব্দকে বদল করতে পারবে না।

৪) এ হাদীসে এমন কথা থাকবে না, যা তার থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করবে।

৫) এমন কোন জিনিস থাকবে না যা হাদীসের মধ্যে কোন দোষ বের করে দেয়।

সংক্ষেপেঃ যার সনদযুক্ত থাকবে ন্যায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ মুখস্থকারী বর্ণনাকারীদের দ্বারা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম বা দোষ থাকবে না।

সহীহ হাদীসের উপর আমলের হুকুম

১) এর উপর আমল করা ওয়াজিব বা জরুরী।

২) তা শরীয়তের দলিল হিসাবে গণ্য হবে।

৩) কোন মুসলাম কোন আমলের মধ্যে যদি সহীহ হাদীস পায় তবে তা বাদ দিয়ে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করতে পারবে না।

হাসান হাদীস

ঐ হাদীস যার সনদযুক্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের স্মরণশক্তি একটু কম থাকতে পারে, কিন্তু কোন ব্যতিক্রম বা দোষ থাকবে না। অর্থাৎ সহীহ হাদীসে বর্ণিত শব্দসমূহ সরাসরি ব্যবহার না করে হয়তো কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়েছে।

হাসান হাদীসের উপর আমলের হুকুম

১) এর হুকুম সহীহ হাদীসের মতই।

২) এটি দলিল হিসাবে গণ্য হবে যদিও তা সহীহ থেকে একটু দুর্বল।

৩) এর উপর আমল করাও ওয়াজিব।

দুর্বল হাদীস

যার মধ্যে হাসান হাদীসের কোন কোন শর্ত বাদ পড়ে গেছে তাকে দুর্বল হাদীস বলে। এর শ্রেণীভেদ-(১) দুর্বল,(২) খুব বেশি দুর্বল,(৩) ওয়াহী বা ক্ষণভঙ্গুর, (৪) মুনকার ও (৫) সবচেয়ে খারাপ হল মওদ্বু বা বানোয়াট।

কিভাবে আমরা কবর যিয়ারত করব?

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেনঃ

"আমি তোমাদের কবর যেয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন যেয়ারত কর, যাতে এটা তোমাদেরকে ভাল কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" (সহীহ মুসলিম)

১) সুন্নাত হচ্ছে তাদের উপর সালাম করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যখন কবরস্থানে প্রবেশ করা বা পাশ দিয়ে যাওয়া হয়। নবী (সঃ) এ কথাগুলো শিখিয়েছেনঃ *"হে বাড়ির বসবাসকারী মু'মিনরা! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ্ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য আযাব হতে মুক্তি চাই।"* (সহীহ মুসলিম)

২) কবরের উপর বসা নিষেধ এবং তার উপর দিয়ে চলাফেরা করার রাস্তা বানানো নিষেধ, কারণ নবী (সঃ) বলেনঃ

"তোমরা কবরের দিকে সালাত পড় না এবং তার উপর বস না।" (সহীহ মুসলিম)

৩) নৈকট্য লাভের জন্য কবরের চারপাশে তওয়াফ করা নিষেধ। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"তারা যেন কাবার চার পার্শ্বে বেশি বেশি তওয়াফ করে।" (সূরা হজ্জ ২২ঃ ২৯)

৪) কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত নিষেধ। কারণ, নবী (সঃ) বলেনঃ *"তোমরা বাসস্থানসমূহকে কবরস্থান বানাবে না। কারণ, শয়তান ঐ সমস্ত বাড়ি হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পড়া হয়।"* (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কবরস্থান কুরআন পাঠের স্থান নয়; বরঞ্চ বাড়ি তার পাঠস্থান। যে সমস্ত হাদীসে বলা হয়েছে কবরস্থানে কুরআন পাঠের কথা তা শুদ্ধ নয়।

৫) মৃতদের কাছ থেকে মদদ বা সাহায্য চাওয়া বড় শির্‌ক। যদিও সে নবী বা ওলী হয়। কারণ অন্যত্র আলস্নাহ্ (সুব) বলেনঃ

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে দোয়া কর না, কারণ তারা তোমার উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারবে না। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ ১০৬)

৬) কবরের উপর ফুলের তোড়া না দেয়া, অথবা তা কবরস্থানে স্থাপন না করা। কারণ, নবী (সঃ) অথবা সাহাবীরা কেউ তা করেননি। তার মধ্যে খৃষ্টানী ভাব রয়েছে। তা উপকার ব্যতীতই পয়সা নষ্ট হওয়ার রাস্তা। গরীবদের যদি ঐ ফুলের পয়সা দেয়া হত, তবে তারাও উপকৃত হত এবং মৃতরাও উপকৃত হত।

৭) কররের উপর কোন সৌধ বানানো বা দেয়াল দেয়া জায়েয নেই। তার উপর কুরআন বা কবিতা হতে কিছু লেখাও নিষেধ। এটাই যথেষ্ট যেম তার উপর বিঘত পর্যন্ত উচু পাথর বা ইট দেয়া, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, এটা কবর। রাসূল (সঃ) ওসমান ইব্‌নে মজউনের কবরে এটা দিয়েছেন, যাতে মানুষ এটাকে কবর বলে বুঝতে পারে।

অন্ধ অনুসরণ

আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ "যখন তাদের বলা হয়, আস ঐ দিকে যা আল্লাহ্ (সুব) অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল-এর দিকে, তারা বলেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।" (সূরা মায়দা ৫ঃ ১০৪)

১) আল্লাহ্ (সুব) আমাদেরকে মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যখন রাসূল (সঃ) তাদের ডেকেছিলেন কুরআনের দিকে ও একত্ববাদের দিকে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট দোয়ার জন্য। তখন তারা বলেছিল আমাদের জন্য বাপ-দাদাদের আক্বীদাই যথেষ্ট, তাই তাদের প্রতিবাদ করে আলস্নাহ্ বলেনঃ তোমাদের বাপ-দাদারা ছিল জাহেল বা অজ্ঞ।

২) আজকে বহু মুসলমানই এ ধরনের অন্ধ অনুসরণের শিকারে পরিণত হয়েছে। লেখক বলেছেনঃ একবার একবার এক দা'য়ীকে দেখেছি এ বলে সে ঘোষণা করছে যে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি জানতেন যে, আল্লাহ্‌র হাত আছে? বাপ-দাদাকে তুলনা করে সে এটা অস্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে কুরআন তা সাবেত করেছে। আল্লাহ্ (সুব) আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্বন্ধে শয়তানকে বলেনঃ

"তোমাকে কি জিনিস ফিরিয়ে রাখল তাকে সেজদা করা থেকে যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ছোয়াদ ৩৮ঃ ৭৫)

কিন্তু তাঁর হাত, সৃষ্টির কোন হাতের সাথে মিল খায় না। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

"তাঁর মত কেউ নেই এবং তিনি সবচেয়ে বেশি শুনেন ও দেখেন।" (সূরা শুরা ৪২ঃ ১১)

৩) অন্যদিকে দেখা যায় আরেক ধরনের ক্ষতিকর অনুসরণ। তা হল কাফেরদের অনুসরণ করা পাপের কার্যে, মেয়েদের বাইরে ঘোরার ক্ষেত্রে এবং সংকীর্ণ পোশাক পরিধান করার ক্ষেত্রে। হায়! যদি আমরা তাদের অনুসরণ করতাম উপকারী জিনিস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন- বিমান তৈরি এবং অন্যান্য তৈরিতে যা আমাদের উপকারে আসত।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আগে কোন কাজ বা কথা বল না।" (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ ১)

সত্যকে প্রত্যাখ্যান কর না

১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (সুব) রাসূলদেরকে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। তাদের হুকুম করেছেন ইবাদত ও একত্ববাদের দিকে ডাকতে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তাঁদের কথা অমান্য করেছে এবং তাঁরা যে সত্যের দিকে ডেকেছিলেন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা হল তাওহীদ। ফলে তাদের পরিণাম দাঁড়াল ধ্বংস।

২) নবী (সঃ) বলেনঃ *"যারা অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারপর বলেছেনঃ অহঙ্কার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে নিকৃষ্ট চোখে দেখা।"* (সহীহ মুসলিম)

৩) সত্য গ্রহণ করা ওয়াজিব, তা কেউ বলুক না কেন। এমন কি শয়তান হতেও। হাদীসে আছেঃ

"রাসূল (সঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বায়তুল মালের চৌকিদার বানিয়েছিলেন। রাত্রে এক চোর আসে চুরি করতে। তিনি তাকে ধরলেন। তখন চোর বার বার তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে শুরু করল এবং তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে শুরু করল। ফলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনেও আসল। শেষের দিন তাকে ধরলেন এবং বললেনঃ অবশ্যই তোমাকে নবীর কাছে সোপর্দ করব। সে বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন একটি আয়াত শিখাব যা পড়লে শয়তান আর তোমার কাছে ঘেষবে না। বললেনঃ কি সেটি? সে বললঃ আয়াতুল কুরসি। যখন আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সঃ)-কে এ ঘটনা বললেনঃ তখন তিনি [রাসূল (সঃ)] বললেনঃ তুমি কি জান কে ঐ ব্যক্তি? সে শয়তান, তোমাকে সত্য বলেছে, কিন্তু সে চরম মিথ্যাবাদী।" (সহীহ বুখারী)